সুভাষিতম

বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।

মেঘনাদ সাহা

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দনসুরভী দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

সমর বাগচী, শঙ্করকুমার নাথ, দীপককুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতীম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak
: e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.
: Whatsapp No. :
9830676330 / 9143264159/7980121478

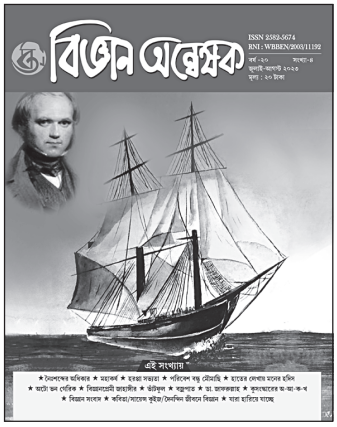

প্রচ্ছদ ছবি : প্রণয় কর্মকার
অঙ্কন : প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ

অপরিহার্য ডারউইন

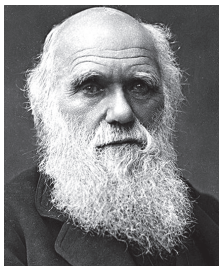

সম্প্রতি এনসিইআরটি (NCERT : National Council of Educational Research & Training) নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে জৈব বিবর্তন তত্ত্ব ও ডারউইনবাদ আর রাখবে না এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞানের এই মৌলিক আবিষ্কারের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এই কাজ তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে তোলার পথে বড় অন্তরায় হবে।

বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে ডারউইনকে তার জীবদ্দশায় অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছে। মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ যে একই—এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে। যা অস্বীকার করার চেষ্টা একরকম গা জোয়ারি মনোভাব। আসলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সৃষ্টির পিছনে কোনো এক অজানা অচেনা অথচ শক্তিশালী সৃষ্টিকারীর ভূমিকা পুরোপুরি নস্যাৎ করা হয়েছে। এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতি সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কোনো ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মেই তা ঘটে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রধান কথা প্রজাতির উদ্ভব, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সর্বপোযোগী প্রজাতির বেঁচে থাকা বা অল্পকথায় বলতে গেলে প্রাকৃতিক নির্বাচন (ন্যাচারাল সিলেকশন) এবং যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন (সার্ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট)। তিনি বলেছেন, "যে সব জীব জীবন সংগ্রামে জয়ী তারা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।"

ডারউইন জীবজগৎকে দেখেছিলেন একটি পরিবর্তনশীল সত্তা হিসেবে, স্থিতিশীল নয়। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে। কিছু নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটছে, কিছু প্রজাতির বিলুক্তি ঘটছে, দ্বিতীয়ত, ডারউইনের মতে, বিবর্তন হল একটি ক্রমিক এবং বিরামহীন প্রক্রিয়া, এর মধ্যে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন জাতীয় ব্যাপার নেই। তৃতীয়ত, ডারউইন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন। সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ রয়েছে সরীসৃপ, পাখি, পতঙ্গ এবং অন্যান্য পাখিদের ক্ষেত্রে। ডারউইন এমনকি এটাও ভেবেছিলেন যে সমস্ত প্রাণ ব্যবস্থা গাছপালা এবং প্রাণীদের উদ্ভব হয়তো একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই ঘটেছে। চতুর্থত, প্রাণীজগতে পরিবর্তন এবং বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া তা ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। যার ফলে উন্নততর জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রাণীরাই অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্ততিদের রেখে যেতে পারছে, অন্যরা নয়।

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪

সূচি

সম্পাদকীয়

১ অপরিহার্য ডারউইন

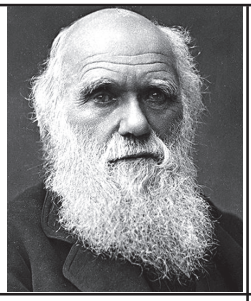

প্রচ্ছদকথা ১

৩ যে সত্য রচেছিলেন ডারউইন

ড. মানসপ্রতিম দাস

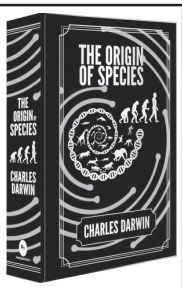

প্রচ্ছদকথা ২

১০ ডারউইনের সমুদ্র অভিযান

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

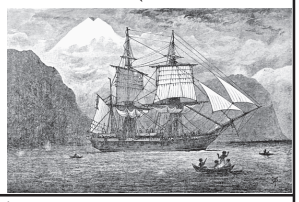

পরিবেশ আইন ২

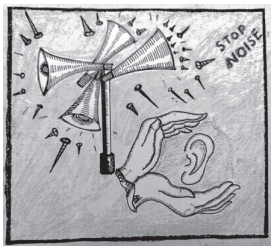

১৩ নৈঃশব্দের অধিকার

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

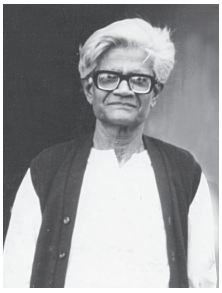

পদার্থবিদ্যা

১৬ মহাকর্ষ

ড. বরুণ কুমার দত্ত

সভ্যতার বিবর্তন

১৭ হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার

অনির্বাণ মান্না

১৯ পরিবেশ বন্ধু

পরিবেশ রক্ষায় মৌমাছি

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের হদিশ

২১ হাতের লেখা

ডা. প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ

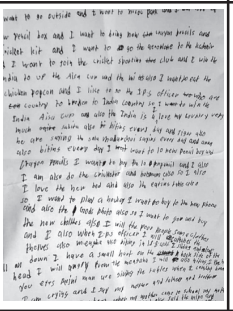

জীবনী

২৩ অটো ভন গেরিক

মৃদুল শ্রীমানী

পরিবেশপ্রেমী জাহাঙ্গীর

২৫ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু জাহাঙ্গীর

প্রবীর বসু

প্রকৃতি পরিবেশ

২৭ ভাঁট ফুলের বন্ধুত্ব

ড. তপন দাস

বজ্রপাত

২৮ বজ্রপাতের নেপথ্যে

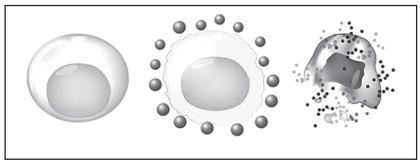

ড. সৌমিত্র চৌধুরী

স্মরণ

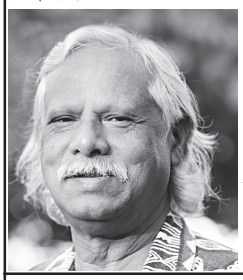

৩০ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও নটরাজ মালাকার

কুসংস্কার

৩১ কুসংস্কারের অ-আ-ক-খ

ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু

৩২ কবিতা

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

সায়েন্স কুইজ

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান অনিন্দ্য দে

২য় প্রচ্ছদ বিজ্ঞানের খবর

পল্লব রায় গুপ্ত

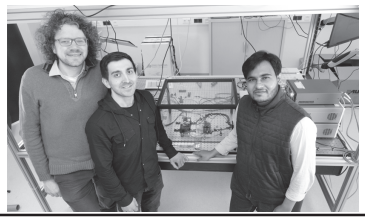

৩য় প্রচ্ছদ : ছবি অঙ্কণ

১. প্লাস্টিক দূষণ রিমা খান, নবম শ্রেণি

২. পরিবেশ দূষণ সহনিকা খাতুন, নবম শ্রেণি

৩. বৃক্ষ রোপণ জেবাজিনাত পারভীন

৪. বিশ্ব উষ্ণায়ণ সৌম্যশ্রী পাল

৪র্থ প্রচ্ছদ

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

ড. রাজা রাউত

ড. মানস প্রতিম দাস

যে সত্য রচেছিলেন ডারউইন

চেতনায় যুগান্তর এনেছিলেন ডারউইন। তাঁর চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন কারা? ডারউইনবাদের আজকের রূপ বোঝার আগে সেই কথাটা জানা খুব দরকার। চার্লস ডারউইনের চিন্তা ও চেতনার এই নির্মাণের দিকটা উপেক্ষা করলে তাঁর তত্ত্বকে হয়ত জানব কিন্তু তত্ত্বের সারবস্তু থেকে সরে যাব অনেক দূরে। তার কারণ, ডারউইন জীবনের ধারাবাহিকতা, বিবর্তনের চলমানতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং তাঁর নিজের চিন্তাকেও ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল হিসাবে দেখা উচিত আমাদের। তবে এখানে মানুষের সভ্যতার আদিতম বিন্দু থেকে শুরু করার দুঃসাহস দেখাব না আমরা। সূচনা করব মোটামুটিভাবে ডারউইনের সমসময় বা তার কিছুটা আগে থেকে।

ভূমিকায় যা লিখেছেন

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইনের প্রথম বই *দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিস বাই মীন্‌স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন* অর দ্য প্রিজারভেশন অফ ফেভারড রেসেস ইন দ্য স্ট্রাগ্‌ল ফর লাইফ। এত বড় নামটা বারবার ব্যবহার করা কঠিন আর তাই কেবল দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিস ব্যবহৃত হয় বারে বারে। এরই ভূমিকায় ডারউইন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কীভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই জীবের বিবর্তন নিয়ে নানা ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে হাতে গোনা কয়েকজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী বলতে শুরু করলেন যে পৃথিবীতে যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণিদের দেখি তাদের রূপ বা প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নয়। ফ্রান্সের এক প্রকৃতিবিদ তথা গণিতজ্ঞ, বিত্তশালী জর্জ লুই লেকলার্ক যাঁকে সবাই চেনে কোঁৎ দ্য বুঁফো নামে, সর্বপ্রথম বিবর্তনের ধারণা দেন বলে অধিকাংশ পন্ডিতের বিশ্বাস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবের রূপের পরিবর্তন হয় তা বললেও বুঁফো বলতে পারেন নি যে কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক প্রভাবের কারণে বা কখনও হয়ত হঠাৎ করেই ঘটে এই পরিবর্তন। মানুষ আর বনমানুষের (ape) মধ্যে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে তার আভাস দেন তিনি। এই যে বস্তুমুখী ধারণা যেখানে তিনি কোনোভাবেই কোনো অলৌকিক শক্তি বা ঈশ্বরকে জায়গা দেন নি তা অবশ্য কিছুটা প্রচ্ছন্ন রাখতে হয়েছিল তাঁকে। লোকনিন্দার ভয়ে তাঁর লেখনীতে সুপ্ত রাখা হয়েছিল এই ভাবনা। ১৭৪৯ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে তিনি চুয়াল্লিশ খন্ডে লেখেন Histoire Naturelle. নিজের বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে এর মধ্যে বিবৃত করলেও সুস্পষ্ট করার সাহস দেখান নি তিনি। এই বুঁফোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিসের ভূমিকা শুরু করেছেন ডারউইন।

'অ্যান হিস্টোরিক্যাল স্কেচ' শিরোনামে এর পর তিনি ল্যামার্ক, হারবার্ট স্পেন্সার, আওয়েন প্রমুখদের স্বীকৃতি দেন সমধর্মী কাজের জন্য। তাঁর সঙ্গে কাজ করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন যিনি সেই আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের কথাও তিনি যথাযথ ভাবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তাঁর দিক থেকে অন্যদের কৃতিত্ব হরণ করার কোনো অপচেষ্টা ছিল না। একইসঙ্গে তিনি এমন কিছু উদাহরণ উপস্থিত করেছেন যেখানে জীবজগতের অস্তিত্বকে যুক্ত করা হয়েছে অলৌকিক হস্তক্ষেপের সঙ্গে। এমনই এক বইয়ের নাম 'ভেস্টিজেস অফ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ক্রিয়েশন'। প্রাসঙ্গিক একটা অংশ উদ্ধৃত করেছেন ডারউইন যার শুরুটা এইরকম, 'The proposition determined on after much consideration is, that the several series of animated beings, from the simplest and oldest up to the highest and most recent, are under the providence of God...' বইয়ের প্রকাশ ১৮৪৪ সালে। ওরিজিন অফ স্পিসিস তখনও প্রকাশিত হয় নি কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশ্যে আলোচিত হয়েছে তার আগেই। ভেস্টিজেস নামে বইয়ের লেখকের নাম পরে অবশ্যই উদ্ধার করা গিয়েছে এবং তিনি হলেন রবার্ট চেম্বারস। তিনি জানতেন ডারউইনের কথা। নিজের বইতে দু' জায়গায় উল্লেখও করেছেন তাঁর কিছু অনুসন্ধানের কথা। কিন্তু কখনই ডারউইনের সিদ্ধান্তকে কোনো গুরুত্ব দেন নি। চেম্বারসের একমাত্র বক্তব্য ছিল যে গোটা জীবজগৎ মহাশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিতত্ত্বকেই পুষ্ট করতে চেয়েছেন তিনি। জীবজগতে বিবর্তনকে উড়িয়ে দেন নি তিনি। বিবর্তনের পেছনে কোনো এক বা একাধিক নীতি বা সূত্রকে মানতেও তাঁর আপত্তি নেই কিন্তু এমন নীতি কেবল ঈশ্বরই তৈরি করতে বা বলবৎ করতে পারেন, এটাই তাঁর ধারণা। সেই সময়ে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বহু তথ্য উল্লেখ করা রয়েছে তাঁর বইতে কিন্তু ডারউইনের কঠোর বস্তুবাদী নীতির কোনো ছায়া পাওয়া কঠিন এই বইতে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা হয়ত পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুবাদ না থাকলে বই বিক্রি হবে না এমন কোনো সূত্র কাজ করে না বাজারে। সে সময়ের পাঠকদের কাছে ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের এই মিশ্রণ অনেক বেশি বরণীয় ছিল। ফলে প্রকাশের এক দশকের মধ্যে এই বইয়ের বিক্রি সংখ্যা দাঁড়াল একুশ হাজার দুশো পঞ্চাশ কপি। ডারউইনের বই বাজারে আসার পরেও এর বিক্রি খুব একটা পড়ে নি। ওরিজিন অফ স্পিসিস বাজারে থাকা সত্ত্বেও সতেরো হাজার পাঁচশো কপি বিক্রি হয় এই বই। অনেকের মনেই প্রশ্ন, পাঠকদের মধ্যে এমন আচরণ কেন! বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা থাকলেও মানুষ বিবর্তন

সম্পর্কে এমন অ-বৈজ্ঞানিক উপস্থাপন গ্রহণ করেন কেন? এর চটজলদি ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে সম্ভাব্য কয়েকটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন পন্ডিতরা। ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী মহলেই নিশ্চয়তা তৈরি হয়নি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। সমাজের নিয়ম অনুযায়ী 'প্রতিষ্ঠান' গ্রহণ করার বহু পরে সাধারণ মানুষ কোনো তত্ত্বকে মেনে নেন। ডারউইনের জন্য অতএব জনপ্রিয় ক্ষেত্র তৈরি ছিল না সে সময়ে। পাশাপাশি ডারউইনের তত্ত্বে বিবর্তনের অভিমুখ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা না থাকায় মানুষ সেটা নিয়ে খুব উৎসাহী ছিল না। তার বদলে বরং ঈশ্বরের মস্তিষ্কে তৈরি একটা পরিকল্পনা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। ফলে চেম্বারসের বইয়ের উত্তরোত্তর বেশি বিক্রি নিয়ে বিস্মিত হওয়ার তেমন কারণ নেই।

প্রেরণার উৎস তিনি

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে অজানা, অনিশ্চিত সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন প্রাশিয়ার এক যুবক— আলেকজান্ডার হুমবোল্ট। অনেক জায়গায় তাঁকে কেবলমাত্র ভূগোলবিদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় বিজ্ঞানী যিনি লাতিন আমেরিকার ভূখন্ড ঘুরে দেখেন ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে। শুধু ঘুরে দেখাই নয়, এই এলাকার বিভিন্ন দেশের পাহাড়-জলাশয়-আগ্নেয়গিরি-গাছপালা-কীটপতঙ্গ-পশুপাখির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দেন তিনি। বেশ কয়েকটা বই লেখেন হুমবোল্ট। সেগুলোর কাটতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় যে বইয়ের তা হল Personal Narrative. এর সাতটা খন্ডের প্রথমটা প্রকাশিত হয় ১৮১৪ সালে। আপাতভাবে এটা একটা ভ্রমণ কাহিনী, সঙ্গে ছিল প্রচুর বৈজ্ঞানিক টীকা। যেভাবে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে শুরু করে নদী উপত্যকা এবং আগ্নেয়গিরি দেখেছিলেন তিনি, সেভাবেই যেন পাঠককে টেনে নিয়ে যেতেন তাঁর গদ্যের সঙ্গে। হুমবোল্টের অন্য একটা বইয়ের নাম Cosmos. ১৮৪৫ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর এই বই, পঞ্চম খন্ডটি অবশ্য বেরোয় ১৮৫৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে। বিজ্ঞান ও প্রকৃতি সম্পর্কে হুমবোল্টের যে বিশ্ববোধ তাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে এই গ্রন্থের পাতায়-পাতায়।

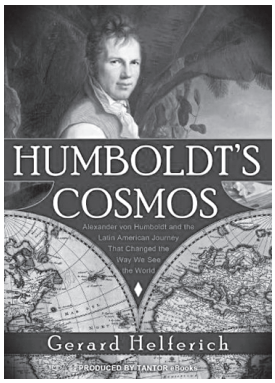

এবারে ডারউইনের উপর হুমবোল্টের প্রভাবের প্রসঙ্গ। ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলের বন্দর পোর্টসমাউথ থেকে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়ল এক জাহাজ, এইচ এম এস বিগ্‌ল। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কিছু দেশের উপকূলরেখা পর্যবেক্ষণ করে নানা বন্দরের সঠিক অবস্থান নথিবদ্ধ করা ছিল এই সমীক্ষার লক্ষ্য। এই জাহাজেই ছিলেন বাইশ বছরের তরুণ অভিযাত্রী চার্লস ডারউইন। দশ ফিট বাই দশ ফিট মাপের একটা ছোট্ট কেবিনে আর দু'জন নাবিকের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ওই সামান্য পরিসরে একটা হ্যামক ছিল শোয়ার জন্য। ছাদ এতই নীচু ছিল যে ছ' ফিট লম্বা ডারউইন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। ওখানেই আবার ছিল বই রাখার তাক। সামান্য কিছু বই রাখা সম্ভব সেখানে। তাই জাহাজে ওঠার আগে খুব যত্ন করে বই বাছতে হয়েছিল ডারউইনকে। একটা অভিধান ছিল স্প্যানিশ-ইংরেজি ভাষার। পাশে ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞানের খানকতক গ্রন্থ। এর সঙ্গে ছিল চার্লস লায়েলের রচিত Principles of Geology প্রথম খন্ড। বাকি যেটুকু জায়গা অবশিষ্ট ছিল সেখানে রাখা ছিল আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্টের Personal Narrative-এর সাতটা খন্ড। চার্লস লায়েল অবশ্যই প্রভাবিত করেছিলেন ডারউইনকে। কিন্তু দূর দেশে পাড়ি দেওয়া এবং একজন স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতিবিদ হিসাবে বিগ্‌ল জাহাজে ভ্রমণের প্রেরণা ডারউইন পেয়েছিলেন হুমবোল্টের লেখা থেকে।

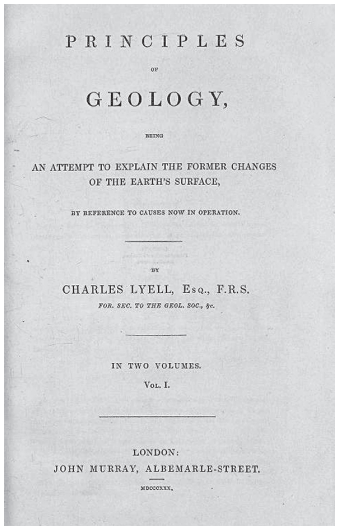
PRINCIPLES
OF
GEOLOGY,
BEING
AN ATTEMPT TO EXPLAIN THE FORMER CHANGES OF THE EARTH'S SURFACE,
BY REFERENCE TO CAUSES NOW IN OPERATION.
BY
CHARLES LYELL, Esq., F.R.S.
FOR. SEC. TO THE GEOL. SOC., &c.
IN TWO VOLUMES.
VOL. I.
LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE-STREET.
MDCCCXXX.

কেমব্রিজে পড়ার সময়ই হুমবোল্টের লেখার প্রতি আকৃষ্ট হন ডারউইন। তাঁর উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষক জন স্টিভেনস হেনস্লো-র সঙ্গে হুমবোল্টের লেখা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন ডারউইন। পার্সোনাল ন্যারেটিভ এত বার পড়েছিলেন তিনি যে ওই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক মুখস্থ ছিল তাঁর। শয়নে-স্বপনে তিনি যেন হুমবোল্টের অভিযানের পথগুলো দেখতে পেতেন। তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠত নদী-উপত্যকা-আগ্নেয়গিরি। বিগ্‌ল জাহাজে করে ঘোরার সময়ও তিনি বাড়িতে চিঠি লিখে জানাতেন যে একমাত্র হুমবোল্টই পেরেছেন ওই নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রকৃতির বর্ণনা দিতে।

১৮৩৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি যখন ডারউইনের Voyage of the Beagle প্রকাশিত হল তখন তার এক কপি সসঙ্কোচে হুমবোল্টকে পাঠালেন তিনি। সঙ্গে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে হুমবোল্টের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের বৃত্তান্তই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে অভিযানে। বই পেয়েই পড়ে ফেলেছিলেন হুমবোল্ট, তারপর এক দীর্ঘ চিঠি লিখে জানান যে এমন একটা বই যদি তাঁর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তবে সেটাই তাঁর সবথেকে বড় সাফল্য। নিজের আইকনের কাছ থেকে এমন প্রশংসা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন ডারউইন। কিন্তু এই পারস্পরিক সম্মানবোধ সম্পর্কে জানাই আমাদের এই প্রবন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়। দু'জনের ভাবনার মধ্যে বস্তুগত মিল বোঝা আরও জরুরি। গ্যালাপ্যাগোস থেকে ফিরে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করতে করতে যখন ডারউইন স্থির ধারণায় এসে পৌঁছচ্ছেন যে ঈশ্বরের হাতে এই পৃথিবী তথা এখানকার জীবকুল সৃষ্টির ধারণাটা ধোপে টেকে না তখনও হুমবোল্টই সমর্থন যোগাচ্ছেন তাঁকে। ব্রিটিশ পক্ষীবিশারদ জন গোল্ড যখন নিশ্চিতভাবে জানালেন, গ্যালাপ্যাগোস থেকে নিয়ে আসা ফিঞ্চগুলো আসলে আলাদা-আলাদা প্রজাতির তখন একটা থেকে আর একটা প্রজাতিতে বিবর্তনের ধারণাটা পেয়ে বসল ডারউইনকে। অপরিবর্তনীয়, ধ্রুব প্রজাতি বলে যে কিছু

থাকতে পারে না সে সম্পর্কে ধীরে ধীরে নিঃসন্দেহ হতে শুরু করলেন ডারউইন। এই পরিবর্তনের কথা বহু আগেই বলে দিয়েছিলেন হুমবোল্ট, দেখিয়েছিলেন যে সমুদ্র এবং মহাসমুদ্র দিয়ে দূরত্ব তৈরি করা থাকলেও দূর দূর দেশে একই জলবায়ুতে একইরকম উদ্ভিদের জন্ম হয়। আকারে ও প্রকারে কিছু ভিন্নতা থাকলেও এই সব উদ্ভিদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। প্রাণীর ক্ষেত্রেও তাই।

তবে হুমবোল্ট ভেবেছিলেন যে প্রজাতির এই ছড়িয়ে পড়ার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। তিনি আরও মনে করেছিলেন, যে প্রজাতির সৃষ্টি এবং অস্তিত্বের উৎসের সঙ্গে এই ভৌগোলিক বন্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে এসে কিন্তু আর একমত হতে পারলেন না ডারউইন। এই বন্টনের মধ্যে থেকেই প্রজাতির উদ্ভবের রহস্য খুঁজবেন বলে ঠিক করলেন।

ডারউইনবাদের মূল বক্তব্য

ডারউইনের যে তত্ত্ব তা নিয়ে যুগে যুগে অনেক আলোচনা, বহু বিশ্লেষণ হয়েছে। সেই ইতিহাসে যাওয়া সম্ভব নয় এই সামান্য পরিসরে। কিন্তু এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য এখানে বিবৃত করা আবশ্যক। ডারউইনের তত্ত্ব বলে,

১। প্রজাতি (species) বলতে বোঝায় জীবিত পদার্থের (organisms) এমন একটা গোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে প্রজনন ঘটায় এবং তার ফলে এমন সন্তান তৈরি হয় যারা আবার প্রজননে সক্ষম।

২। জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের বর্তমান প্রজাতি তাদের আগে উপস্থিত প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তন/পরিবর্তনের (modifications) মাধ্যমে।

৩। প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) ব্যাখ্যা করে কীভাবে এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

—প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। তার উপর ভিত্তি করে যত জীব বাঁচতে পারে তার থেকে বেশি জীব জন্ম নেয়

—সম্পদের (খাবার, বায়ু, জল, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজন) অধিকারের জন্য লড়াই চলে জীব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে

—একটা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা সদস্যরা একে অন্যের থেকে বৈশিষ্ট্যে পৃথক হয়; এগুলোর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে বাহিত হয় সন্তানের মধ্যে

—কোনো একটা স্থানীয় পরিবেশে টিঁকে থাকা এবং প্রজননের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের তুলনায় সুবিধেজনকভাবে অভিযোজিত

—যে সব সদস্য বেশি ভালোভাবে অভিযোজিত তারা টিঁকে থাকা এবং প্রজননে বেশি সক্ষম আর তাই তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের (আজকের ভাষায় gene) প্রতিলিপি পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত করাতে পারে

—যে সব প্রজাতির সদস্য সবথেকে সুবিধেজনকভাবে অভিযোজিত সেই সব প্রজাতি টিঁকে থাকে, অন্যান্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়।

যে কোনো তত্ত্বের সপক্ষে প্রমাণের প্রয়োজন হয়। বিগ্‌ল জাহাজে ভ্রমণের সময় জীবজগতের যে সব নমুনা নিজে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ডারউইন তার থেকে সমর্থনকারী অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে একটা অবশ্যই ছিল ফিঞ্চ বলে একটা পাখির ঠোঁটের বৈচিত্র্য। আজ সবাই মোটামুটি জানে যে ডারউইন নমুনা সংগ্রহের কাজ করেছিলেন গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের নানা দ্বীপে। ইকুয়েডর নামে দেশটার উপকূল থেকে বেশ কিছুটা সরে নিরক্ষরেখা বরাবর গ্যালাপ্যাগোসের অবস্থান। তেরোটা বড় দ্বীপ এবং একশোটারও বেশি ছোট দ্বীপের অবস্থান এই অঞ্চলে। এমন বহু পশুপাখির প্রজাতি রয়েছে এখানে যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। বিরাটাকার কচ্ছপ, ইগুয়ানা, ঘন রোমের আবরণে ঢাকা সীল, সী লায়ন, হাঙর এবং ছাব্বিশ ধরণের পাখির প্রজাতি রয়েছে এখানে। এদের মধ্যে চোদ্দটা প্রজাতির পরিচিতি ঘটে গেছে ডারউইনের ফিঞ্চ হিসাবে। এই সব ফিঞ্চকে পৃথিবীর সবথেকে দ্রুত বিবর্তনশীল মেরুদন্ডী প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ দ্বীপগুলোর বিচ্ছিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেদের শরীর এবং আচরণ অত্যন্ত দ্রুত পাল্টে ফেলেছিল এই সব পাখিরা। এমন পাখিদের নমুনা সংগ্রহের সময় ডারউইন যে খুব সচেতনভাবে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন তা একেবারেই নয়। কিন্তু লন্ডনে ফিরে নমুনাগুলো এক জায়গায় এনে তিনি বুঝতে পারেন যে প্রত্যেকটা পাখি আলাদা হলেও তারা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

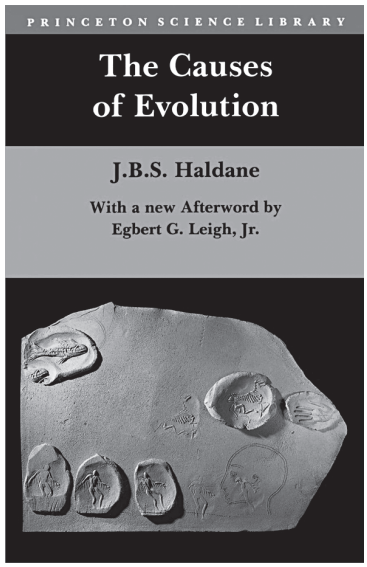

ডারউইনের পরে এ ব্যাপারে প্রমাণ সংগ্রহের কাজটা শেষ হয়ে যায় নি। প্রজাতির মধ্যে সম্পর্কের একটা সুন্দর প্রমাণ রয়েছে ১৯৩২ সালে লেখা জন বার্ডন স্যান্ডারসন হলডেনের লেখা বই The Causes of Evolution-এ। হলডেন বলছেন, জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে স্তন্যপায়ীদের অধিকাংশ ইউরিক অ্যাসিডকে দ্রবণীয় একটা যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে। এই যৌগের নাম allantoin. বাঁদরদের বেশিরভাগ ধরণ এই কাজটা করতে পারে। কিন্তু মানুষের শরীর এই রূপান্তরের কাজটা করতে পারে না। তাই সে অস্থিসন্ধির সমস্যা gout-এ ভোগে। এই একই সমস্যায় ভোগে গোরিলা আর শিম্পাঞ্জিরা। এই একটা প্রমাণ আমাদের ভাবতে সাহায্য করে যে মানুষ এবং এই সব বনমানুষ (ape) একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাঁদরদের সঙ্গে এই সম্পর্ক নেই আমাদের। অন্য আর একটা প্রমাণ এই সম্পর্ককে জোরদার করে। মানুষের শরীরে যেমন রক্তের গ্রুপ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা তেমন গ্রুপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ওই বনমানুষদের মধ্যেও। এমনভাবেই নানা প্রমাণের ভিত্তিতে পূর্বের এক প্রজাতির সঙ্গে পরবর্তী সময়ের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শক্ত হয় ডারউইনবাদের ভিত্তি।

ডারউইনের জনপ্রিয়তা

বিজ্ঞানের নতুন তত্ত্ব সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে। জনপ্রিয় ঢঙে সেটাকে পরিবেশন করার কথা ভাবেন না কেউ। ডারউইন ভিন্ন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর বই সাধারণ মানুষ পড়ুক। সেই লক্ষ্যে প্রথম দিকে লেখা শুরু করলেও ওরিজিন অফ স্পিসিসের দৈর্ঘ্য জুড়ে তালটা বজায় রাখতে পারেন নি ডারউইন। প্রথমবার প্রুফ দেখার পর প্রচুর সংশোধন করতে হয় তাঁকে। বিজ্ঞানের ভাবনা প্রকাশের শর্ত মানতে গিয়েই তাঁকে করতে হয়েছিল এইসব। কিন্তু এতে যে বইটা ভারী হয়ে যাচ্ছে সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারেন। এ ব্যাপারে অনেকের কাছেই দুঃখ করেন তিনি।

যাই হোক, সে সময়ের যে পাঠকমন্ডলী তাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয় হলেন জন জর্জ উড। বিজ্ঞান লেখাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। রুটলেজের প্রকাশনায় তাঁর রচিত 'কমন অবজেক্টস' ঢের ঢের বেশি জনপ্রিয় হয় ডারউইনের বইয়ের থেকে। বিক্রিও হয় সেইভাবে। উডের দায়িত্ব ছিল না বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করার। তিনি সাধারণ মানুষদের জন্যই লিখেছিলেন। সেখানে প্রচুর ছবির সমাবেশ ছিল। তুলনায় ডারউইনের বই ছিল এক রকমের মিশ্র রচনা। সেখানে ছবি ছিল না একেবারেই। তাহলে আর পাঠক নেবেন কেন সেটা? এই অবস্থায় ডারউইন যাঁর কাছে সবথেকে বেশি আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর 'বুলডগ'—টমাস হেনরি হাক্সলি। গোঁড়া বিশপের সঙ্গে লড়ে গিয়েছিলেন এই হাক্সলি। ডারউইনের তত্ত্বকে সমর্থন করতে গিয়ে তাঁকে শুনতে হয়েছিল, 'তা মহাশয়, আপনি কোন অংশে বানর থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন নিজেকে? ঠাকুরদার দিক থেকে না ঠাকুরমার দিক থেকে?' বিশপের এই বিদ্রূপের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মূর্খ বিশপের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখার বদলে তিনি বরং বাঁদরের বংশধর হতে বেশি পছন্দ করবেন। আমরা সবাই জানি যে বিবর্তনের ধারায় বানরের শাখাটি আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত নয়। তাতে কী! কাগুজে বাঘেরা এভাবেই সমালোচনা করতে চাইতেন ডারউইনের সমর্থকদের।

১৮৬৩ সালে হাক্সলি তাঁর 'সিক্স লেকচারস টু ওয়ার্কিং মেন' বক্তৃতায় যেভাবে বিবর্তনকে তুলে ধরেন তাতে চমৎকৃত হন ডারউইন। নিজের তত্ত্বকে তুলে ধরতে হাক্সলিকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তিনি। কিন্তু হাক্সলি নিজেও একজন বিজ্ঞানী। কাজ আছে তাঁরও। ফলে এক সময় স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে জনপ্রিয় বই লেখার ব্যাপারে সময় দিতে পারবেন না তিনি। সেটা ১৮৬৫ সালের পয়লা জানুয়ারি। আশাভঙ্গ হল ডারউইনের।

যোগ্যতমের উদ্বর্তন এবং কিছু বিকৃতি

ইংরেজিতে Survival of the Fittest. যে বেশি মানিয়ে নিতে পারবে সেই টিকে থাকবে এবং বংশবৃদ্ধি করবে। এই যোগ্যতা যে সব জায়গায় একরকমের হতে হবে তার কোনো মানে নেই। পেশীবহুল, চর্বিযুক্ত, লম্বা, বেঁটে, ভারী, ছিপছিপে, ক্ষিপ্র, স্লথ—কোনটা যে কোথায় 'যোগ্যতম' বলে বিবেচিত হবে তা পরিস্থিতি না বুঝে নিশ্চিত করা অসম্ভব। অর্থাৎ একই বৈশিষ্ট্য সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এটা গেঁথে গিয়েছে যে শক্তিশালী বা ক্ষিপ্র জীবরাই টিকে থাকার জন্য সবথেকে বেশি উপযুক্ত। ঐতিহাসিক নানা উপাদান এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে এক সমাজতাত্ত্বিকের কথা আনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা হয়ত ততটা মাথা ঘামান না তবে দার্শনিকদের কাছে সোশ্যাল ডারউইনিজম একটা পাঠ্যবস্তু। এর প্রবক্তা ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক হারবার্ট স্পেন্সার। ডারউইনের ওরিজিন অফ স্পিসিস প্রকাশিত হওয়ার আট বছর আগে, ১৮৫১ সালে তিনি নিজের তত্ত্ব সামনে আনেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য ছিল যে সমাজের উন্নতির স্বার্থে দরিদ্র বা অক্ষম মানুষদের সাহায্য করা বন্ধ করা উচিত। দরিদ্র, চরিত্রহীন বা দুষ্কর্মকারীরা মারা গেলে সমাজের উন্নতি হবে, আগামী সমাজ তাদের সন্তানদের দিয়ে পূর্ণ হবে না। যেহেতু ডারউইনের বই প্রকাশিত হওয়ার আগেই এমন মারাত্মক তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন স্পেন্সার তাই বিষয়টাকে সোশ্যাল ডারউইনিজম না বলে সোশ্যাল স্পেন্সারিজম বলাটাই সঙ্গত বলে মনে করেন অনেকে। যদিও ডারউইন তাঁর বইতে জীবনের জন্য সংগ্রামের কথা বলেছেন কিন্তু তিনি মূলতঃ মনুষ্যেতর প্রাণীদের জন্য বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন। স্পেন্সার সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষের সমাজে নিষ্ঠুর সংগ্রাম আর নির্মমতাকে শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' স্পেন্সারের তৈরি শব্দবন্ধ, ডারউইনের নয়। তবে হ্যাঁ, স্পেন্সারের এই শব্দবন্ধ ডারউইনকে উৎসাহিত করেছিল এবং ওরিজিনের চতুর্থ সংস্করণে ডারউইন এটা ব্যবহার করেন 'ন্যাচারাল সিলেকশন'এর ভালো বিকল্প হিসাবে! বাস্তবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদলের বিরুদ্ধে এবং সমাজে একটা সুবিধেভোগী শ্রেণির ক্ষমতা বলবৎ রাখতে সোশ্যাল ডারউইনিজম প্রয়োজনীয় ছিল। সরাসরি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না স্পেন্সার। তাঁকে বলা চলে অ্যাগনস্টিক, যিনি মানেন যে ঈশ্বর আছেন কি নেই তা জানা সম্ভব নয়। ধর্মের সাহায্যে সেই জানার কাজটা অসম্ভব বলে মনে করতেন তিনি। বিজ্ঞানে তাঁর প্রবল আস্থা ছিল। স্পেন্সার মনে করতেন যে বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সব ব্যবস্থা বোঝা সম্ভব।

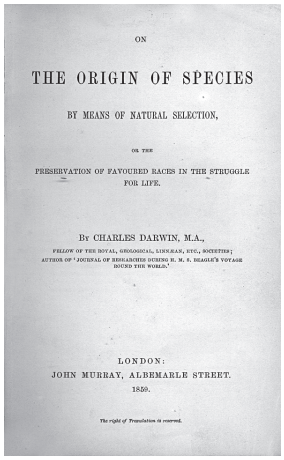

ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

BY CHARLES DARWIN, M.A.,

FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNEAN, ETC., SOCIETIES; AUTHOR OF "JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE ROUND THE WORLD."

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

The right of Translation is reserved.

এহেন স্পেন্সারের ভক্ত বা অনুসারীরাও বিবর্তনের কথা লিখতে

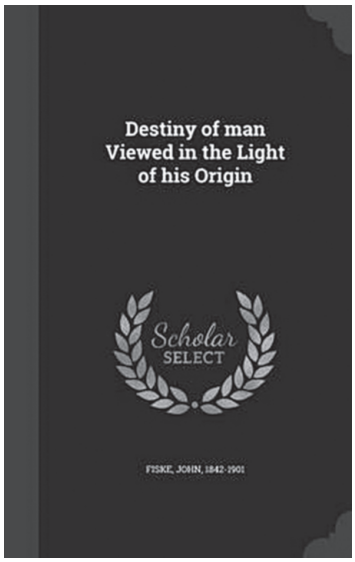

শুরু করেছিলেন ডারউইনের জীবৎকালেই। মার্কিন ইতিহাসবিদ জন ফিসকে এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা একটি বইয়ের কথা আলোচনা করলে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বটা পরিষ্কার হবে। ১৮৮৪ সালে তিনি লেখেন 'ডেস্টিনি অফ ম্যান ভিউড ইন দ্য লাইট অফ হিজ ওরিজিন'। এটারও প্রচুর কপি বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু বিক্রির সংখ্যা না ভেবে বইয়ের মধ্যে কী ছিল তা দেখা প্রয়োজন। ফিসকে ডারউইনের বস্তুবাদের তোয়াক্কা না করে যেমন নিয়ে এলেন ঈশ্বরের বিধানকে তেমনি আনলেন 'মানবতা'র অগ্রসরতাকে। তিনি যাচ্ছেন ডারউইনের বিরুদ্ধে অথচ ব্যবহার করছেন ডারউইনের নাম। ব্যাপারটা বেশ মজার। বিজ্ঞানীদের আক্রমণ করে ফিসকে বলছেন যে তাঁরা অযথাই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের থেকে মানুষের উদ্ভবের সপক্ষে গলা চড়াচ্ছেন। ডারউইন মানবতা নিয়ে কোনো কথা বলেন নি। অথচ দিব্যি ডারউইনের নামে সেটাকে চালিয়ে দিলেন ফিসকে। যেখানে ডারউইন বিবর্তনের কোনো অভিমুখ মানতে চান নি সেখানে ফিসকে লিখলেন যে ডারউইন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানুষ তৈরির লক্ষ্যেই বিবর্তনকে চালিত করে প্রকৃতি! ডারউইনকে তিনি আধ্যাত্মিকতার অন্যতম জনক হিসাবেও তুলে ধরলেন। বললেন যে বিবর্তনের তত্ত্ব বোঝাচ্ছে, জীবজগতের সব প্রক্রিয়া আধ্যাত্মিকতার বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে যা মানবতার সুউচ্চ বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের তত্ত্বের বিকৃতির ইতিহাসে 'মানবতা' এবং 'আধ্যাত্মিকতা' এনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন জন ফিসকে। মানুষ প্রাণভরে সেটা গ্রহণও করল!

তার মানে অবশ্য এই নয় যে ডারউইনের রচিত জীবজগতের বিবর্তনের বস্তুভিত্তিক ধারণা আধ্যাত্মিকতার গর্ভে বিলীন হল। ডারউইনবাদ রইল স্বমহিমায়।

ডারউইনবাদে নতুনত্ব

এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির সৃষ্টি, আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই, প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদি মূল বিষয়গুলো মেনে নিয়েও ডারউইনবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশোধন এনেছেন বিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা। এমন বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন জন বার্ডন স্যান্ডারসন হলডেন (১৮৯২ — ১৯৬৪)। ডারউইনের গবেষণা প্রকাশ্যে আসার পর একশো বছরে যে সব নতুন তথ্য উঠে এসেছে বিজ্ঞানীদের গবেষণার হাত ধরে সেগুলোর মধ্যে সবথেকে মূল্যবান কয়েকটি তথ্যকে বিশ্লেষণের জন্য সাজিয়ে দেন তিনি। তালিকায় রয়েছে বংশগতির মূলে যে 'জিন' রয়েছে তার

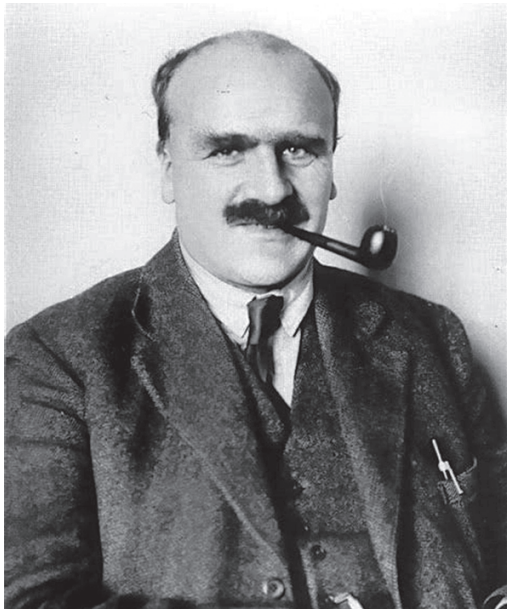

জন বার্ডন স্যান্ডারসন হলডেন

আবিষ্কার, জিনের বৈশিষ্ট্য (genotype) এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের (phenotype) মধ্যে পার্থক্য, নির্বাচনের ফলে শুধু যে পরিবর্তন হয় তাই নয় বরং বৈচিত্র্যও যে বজায় থাকে সেই ব্যাপারটার উপলব্ধি। এছাড়াও আছে ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মেলামেশার ফলে উদ্ভূত নতুন প্রজাতির অস্তিত্ব (allopolyploidy) এবং বিকাশের (development) ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা।

প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে মৌলিক ভাবনা ছিল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হলডেনের। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে সব প্রজাতিরই বদল হয় কিন্তু সব বদল বংশানুক্রমে পরের প্রজন্মে চলে যায় না। প্রজাতিতে যে সব বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক সেগুলো থেকে হওয়া বদলের অধিকাংশকে প্রশ্রয় দেয় না প্রাকৃতিক নির্বাচন। কয়েকটা মাত্র বদল ঠাঁই পায় নির্বাচনের তালিকায়। এই নির্দিষ্ট বদলগুলো বাহিত হলে বিবর্তন ঘটে। যে কথাটা বলে হলডেন সতর্ক করে দেন বিজ্ঞানীদের তা হল, প্রাকৃতিক নির্বাচন আসলে একটা প্রজাতির চরিত্রকে বদল করে না বরং স্থির রাখার চেষ্টা করে। অধিকাংশ পরিস্থিতিতে যে সব পরিবর্তন ঘটে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ বিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে পার্থক্য তা অটুট রাখতেও প্রাকৃতিক নির্বাচন ভূমিকা নেয়। ডারউইন বা ওয়ালেস কিন্তু এভাবে ভাবেন নি। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা, সংরক্ষক হিসাবে নয়। ১৯৫১ সালে কার্ন এবং পেনরোজের করা এক সমীক্ষা উদ্ধৃত করে হলডেন দেখান যে সদ্যোজাত শিশুর ওজন গড় ওজনের যত কাছে থাকে তত তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। গড় ওজনের থেকে খুব কম বা খুব বেশি ওজন নিয়ে জন্মায় যে সব শিশু তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম।

বিবর্তনের গতিপথ নিয়েও নতুন কথা শোনান হলডেন। ডারউইন ভেবেছিলেন যে খুব ছোট ছোট ধাপে বিবর্তন ঘটে। কিন্তু হলডেন

বলছেন যে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে, বিবর্তনের কয়েকটা ধাপ বেশ ব্যতিক্রমী এবং তা ঘটে গিয়েছে আচমকা। সুপরিচিত আরও একটা উদাহরণ উপস্থিত করেন হলডেন। সেটা হল গায়ে ছিটে দেওয়া হালকা রঙের মথের (Biston betularia) শরীরে রঞ্জক কণার উপস্থিতির ক্ষেত্রে বড়সড় পার্থক্য গড়ে ওঠা। এমনিতে এই মথ হাল্কা রঙের। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই ধরণের মথের টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি কারণ পাখিরা চট করে দেখতে পায় না এগুলোকে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ইংল্যান্ডে যে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সর্বত্র যে ভুসো কালির আধিক্য ঘটেছিল তাতে পাখিদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পেরেছিল কেবলমাত্র ঘন রঙের মথ। এদের উপপ্রজাতির নাম ছিল carbonaria. ১৮১১ সালের আগে মথের এই ধরণটা জানাই ছিল না। ইংল্যান্ডের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারে ১৮৪৮ সালে প্রথম সংগৃহীত হয় এই ঘন রঙের মথ। উনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ এই ঘন রঙের যে ধরণ তার অস্তিত্ব পৌঁছে যায় আটানব্বই শতাংশে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রায় হারিয়েই যায় হাল্কা রঙের উপপ্রজাতি typica. বিবর্তনের জন্য সাধারণভাবে যতটা সময় প্রয়োজন হয় তার তুলনায় একটা শতকের কিছুটা অংশ অতি সামান্যই। তাই বলা যায় যে এখানে বিবর্তন ঘটেছে উল্লম্ফনের মাধ্যমে। জিনগত বিশ্লেষণকেও নিজের বক্তব্যের সমর্থনে হাজির করেন হলডেন। শরীরের কোষে যত জিন থাকে তার অনেকগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি বিবর্তন হয় তবে তার জন্য সময় প্রয়োজন হয় অনেক। কিন্তু এই মথের ক্ষেত্রে একটা মাত্র জিনে পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে গিয়েছে গায়ের রঙের বদল। তাই বিবর্তন ঘটেছে চটপট।

তবে ডারউইনবাদের যে আবশ্যিক সংশোধন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন হলডেন তার পোশাকী নাম Allopolyploidy. এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ প্রজাতির উদ্ভব হচ্ছে একটা মাত্র প্রজন্মে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াই। এমনিতে polyploidy বলতে বোঝায় দেহকোষের নিউক্লিয়াসে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক (মূলতঃ দু'য়ের থেকে বেশি) ক্রোমোজোমের গুচ্ছ (set) থাকা। মানুষের দেহকোষে রয়েছে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম। মানে দুটো গুচ্ছ। প্রজননের সময় যে জননকোষ তৈরি হয় তাতে থাকে তেইশটা ক্রোমোজোম। এমন কোষ হল haploid. তাহলে মানুষের দেহকোষ হল diploid. যে গম খাই আমরা তার কোষে ছ'টা গুচ্ছ থাকে। এখন Allopolyploidy ঘটার জন্য দুটো ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী থেকে প্রজনন কোষ আসা দরকার। এমন একটা উদাহরণ হল খচ্চর। পুরুষ গাধা আর মহিলা ঘোড়ার মিলনে তৈরি হয় খচ্চর। গাধার দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বাষট্টি, ঘোড়ার দেহকোষে চৌষট্টি। তাহলে দুই প্রাণীর জননকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা যথাক্রমে একত্রিশ ও বত্রিশ। এই দুটো মিলে যে সন্তান সেই খচ্চরের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা তেষট্টি যা বেজোড়। মিওসিস নামে কোষ বিভাজনের যে প্রক্রিয়া সেখানে জোড় সংখ্যা একান্তই দরকার। এই পদ্ধতিতেই তৈরি হয় জননকোষ। সে কোষ তৈরি না হলে প্রজনন সম্ভব নয়। তাই খচ্চর প্রজনন করতে পারে না। কিন্তু সে একটা নতুন প্রজাতি হয়ে আবির্ভূত হয় পৃথিবীতে। এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা নেই। বড়জোর প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে সে প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এটুকুই নির্বাচনের ভূমিকা। ডারউইন বা ওয়ালেসের তত্ত্বের ব্যতিক্রম এখানে ধরা পড়ছে বলে জানান হলডেন।

ডারউইনের তত্ত্বের ক্ষেত্রে সংশোধন আনার ব্যাপারে হলডেন নিশ্চিতভাবে একা নন। অনেক মেধাবী গবেষক এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কিন্তু খ্যাতি পেয়েছেন যে দু' একজন তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্টিফেন জে গোল্ড। ২০০২ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ The Structure of Evolutionary Theory-তে। তিনি বেশকিছু সন্দেহের প্রসঙ্গ আনেন। জীবাশ্ম সংক্রান্ত প্রমাণের নিশ্চয়তা নিয়ে এই সন্দেহ অবশ্য গোল্ড বহন করে নিয়ে চলেছেন তিন দশক ধরে। গোল্ডের যে তত্ত্ব তা প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। নাইলস এলড্রেজের সঙ্গে মিলে তিনি যে তত্ত্ব দেন তা খ্যাতি পেয়েছে punctuated equilibrium নামে। এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে হলডেনের বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। গোল্ড বলেন, কখনও কখনও প্রজাতির উদ্ভব ঘটে আচমকা। নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে অবধি সেই প্রজাতির মধ্যে খুব সামান্যই পরিবর্তন আসে। এ ব্যাপারটাকে আর একটু বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে।

ডারউইন মনে করতেন যে বিবর্তনের গতি অত্যন্ত ধীর। খুব মসৃণ না হলেও ধাপে ধাপে ঘটে। বহু দিন ধরে একটা প্রজাতি অল্প অল্প পরিবর্তন জমা করে একটা নতুন প্রজাতিতে রূপ পায়। তিনি এও মনে করতেন যে বিবর্তনের এই হার স্থির নয়, একই গতিতে বিবর্তন ঘটে না। অনেক ক্ষেত্রে এক একটা প্রজাতি লম্বা সময় ধরে একই আকৃতি বা প্রকৃতি বজায় রাখে। সে যাই হোক, বিবর্তন যদি এত ধীরে, ধাপে ধাপে ঘটে থাকে তবে প্রত্যেকটা ধাপের নিদর্শন নিশ্চয়ই থেকে যাবে জীবাশ্মের মধ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বহু ধাপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবাশ্ম খুঁজে পান নি। ডারউইন নিজেও অতৃপ্ত ছিলেন জীবাশ্মের এই অলভ্যতা সম্পর্কে। ১৯৭২ সালে গোল্ড আর এলড্রেজের নতুন তত্ত্ব এই ব্যাপারে একটা নতুন দিগন্ত সূচিত করল। নতুন ব্যাখ্যা আনলেন তাঁরা। বললেন যে আসলে প্রজাতির উদ্ভবের ঘটনা একটা বিস্ফোরণের মত। একবার উদ্ভূত হয়ে গেলে তারপর লক্ষ কোটি বছর ধরে তার সদস্যদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। তারপর আবার একটা 'বিস্ফোরণে' নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। এমনভাবে হয় বলেই জীবাশ্মের মধ্যে ডারউইনের ভাবনা অনুযায়ী ছোট ছোট ধাপের কোনো নিদর্শন নেই। এই তত্ত্বের আরও একটা বক্তব্য হল, প্রজাতির মধ্যে যে পরিবর্তন তা মূল স্রোতে থাকা সদস্যদের মধ্যে ঘটে না। কারণ সে পরিবর্তন ঘটলেও স্থায়ী হবে না। সম বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে এত বেশি প্রজননের ঘটনা ঘটে যে পরিবর্তন ভেসে চলে যায়। বরং নতুন প্রজাতি তৈরির ঘটনা ঘটে প্রজাতির সীমানায়। সেখানে একটা ছোট গোষ্ঠী সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং এমন কিছু

পরিবর্তন ঘটতে পারে তাদের দেহে বা চরিত্রে যা টিকে থাকার জন্য অনেক বেশি সুস্থায়ী বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে পারে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে সেখানে অন্যান্য সমধর্মী জীবের সঙ্গে প্রজননও ঘটে না। স্থায়ী হয় পরিবর্তন। আবার এই বিচ্ছিন্নতাই ব্যাখ্যা করে যে কেন আগের প্রজাতির অবস্থানের জায়গায় নতুন প্রজাতির জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন প্রজাতি হওয়ার মত পরিবর্তন ফুটে উঠছে তাদের সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় কোনো এক সদস্যের জীবাশ্মে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। নতুন প্রজাতি কেবলমাত্র তখনই পুরনো প্রজাতির বাসস্থানে জীবাশ্ম রেখে যাবে যখন সেটা এতটাই উন্নত বা সফল হবে যে পুরনো জায়গায় ফিরে আসার মত ক্ষমতা রাখতে পারে। গোল্ডের তত্ত্বের সপক্ষে প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে অনেক জীবের জীবাশ্মই পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা। ব্রায়োজোয়ান নামে প্রবাল জাতীয় এক জীব খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা যেগুলো এই নিয়ম মেনে চলে। জীবাশ্মের নথি অনুযায়ী চোদ্দ কোটি বছর আগে প্রথম আবির্ভাব ঘটে এই ব্রায়োজোয়ানের। পরবর্তী চার কোটি বছর ধরে এর কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তারপরে হঠাৎ করেই ঘটল সেই 'বিস্ফোরণ'! এর পরে আবার সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রজাতির বৈশিষ্ট্যে স্থায়িত্ব অটুট রইল। তবে গোল্ডের তত্ত্ব বা মডেল নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। বহু বিজ্ঞানী জানতে চেয়েছেন যে এই punctuated equilibrium কি ব্যতিক্রম নাকি এটাই বিবর্তনের মূল ধারাকে সূচিত করে? এছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন আছে এইভাবে বিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়া বা তার জন্য দায়ী জিনসজ্জা সম্পর্কে।

তবে নিজের তত্ত্বের সপক্ষে কোমর বেঁধে কলহ করার জন্য খ্যাতি ছিল স্টিফেন জে গোল্ডের। আর এক ডারউইনবাদী এবং ঘোরতর নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্সের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক (নাকি ঝগড়া?) সংশ্লিষ্ট সবার আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল এক সময়। এই বিতর্ককে কিছুটা অনুসরণ করার চেষ্টা করব এখানে। বিতর্ককে কেন্দ্র করে যে সব কথা বিনিময় হয়েছে তার মধ্যে থেকে ডারউইনের ভাবনা নতুন আলোতে উপস্থিত হবে বলেই বিশ্বাস। ১৯৯৭ সালের ১২ই জুন 'দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ'তে এক প্রবন্ধ লেখেন গোল্ড যার শিরোনাম বেশ চমকপ্রদ। Darwinian Fundamentalism শীর্ষক এই প্রবন্ধে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন রিচার্ড ডকিন্সকে। গোল্ডের মতে এই ডারউইনীয় গোঁড়ামির অন্যতম ধ্বজাধারী হলেন রিচার্ড ডকিন্স। তাঁকে আক্রমণ করতে গিয়ে গোল্ড The Origin of Speciesএর শেষ সংস্করণের কয়েকটা পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে ডারউইন স্পষ্ট করেই লিখছেন যে নিজের বক্তব্যের ভুল অর্থ হতে দেখে তিনি মর্মাহত। তিনি কখনই বলেন নি যে প্রজাতির রূপান্তর কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে ঘটে। বইয়ের একেবারে প্রথম সংস্করণেই তিনি লিখেছিলেন এই কথাগুলো,

'I am convinced that natural selection has been the main but not the exclusive means of modification.'

এই বিবৃতি সত্ত্বেও তাঁর মতের অপব্যাখ্যা হয়েছিল একইভাবে। ডারউইনের এই কথাগুলো তুলে এনে নিজের সমসময়ে যে গোঁড়ামি দেখতে পাচ্ছেন তার আলোচনায় প্রবেশ করেছেন গোল্ড। ডকিন্সের সঙ্গেই তিনি সমালোচনা করেছেন ড্যানিয়েল ডেনেটের যাঁর বই Darwin's Dangerous Idea বেশ একটা হইচই ফেলেছিল সংশ্লিষ্ট মহলে। গোল্ড বলেন যে ডেনেট নিজের বইয়ের পাতায় তাঁর তত্ত্বকে নানারকম খারাপ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। ডেনেট অবশ্য ওই একই পত্রিকার পৃষ্ঠায় চিঠি লিখে জানান যে স্টিফেন জে গোল্ডের মত বিখ্যাত ব্যক্তির কাজকে হেলাফেলা করবেন এত কাঁচা লেখক তিনি নন। তিনি এও জানান যে প্রকাশের আগে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি পাঠিয়েছিলেন গোল্ডের কাছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের সঙ্গে গোল্ডের বিতর্ক এমন জায়গাতে পৌঁছেছিল যে Dawkins vs. Gould-Survival of the Fittest নামে একখানা বই লিখে ফেলেন জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত দর্শনের পন্ডিত কিম স্টেরেলনি। বইয়ের আন্তর্জাতিক বাজারে এটা বেস্টসেলার হয়ে ওঠে। জিনের বাহক হিসাবে জীবের গুরুত্বকে স্বীকার করেন ডকিন্স। গোল্ড মনে করেন জীব (organism) এবং তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জিনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিবর্তনের গতিপথে chanceকে যতটা গুরুত্ব দেন গোল্ড ততটা দিতে একেবারেই নারাজ ডকিন্স। তবে পার্থক্যের প্রসঙ্গ আলোচনার পরেও দুই বিবদমান জীববিজ্ঞানীর ভাবনার মধ্যে মিলের জায়গাটাও দেখিয়েছেন স্টেরেলনি।

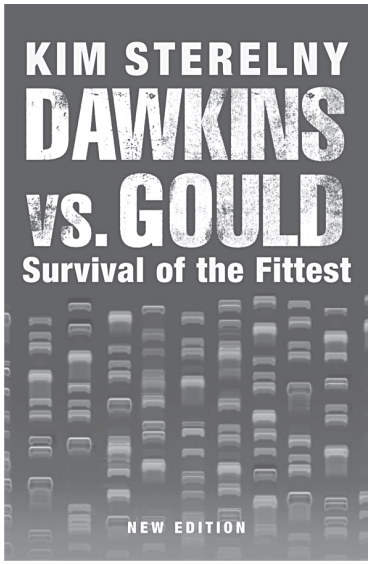

এভাবেই আজও বিবাদ-বিতর্ক-প্রমাণ-সংশয় ঘিরে রেখেছে ডারউইনের তত্ত্বকে। ডারউইনবাদের মূল কাঠামোকে বাতিল করা আজ আর বোধহয় কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব না। তবে হ্যাঁ, বিবর্তনের প্রকৃত গতিপথ নিয়ে মতভেদ এবং জোরালো বিতর্ক থাকবেই। এগুলো বিজ্ঞানের বিতর্ক। অন্যদিকে আমাদের দেশে এবং বিদেশে রয়েছেন এমন কিছু মানুষ যাঁরা বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকে না বুঝে আজও ডারউইনবাদকে নস্যাৎ করার হাস্যকর প্রয়াস করেন। একবিংশ শতকে তাঁরা কূপমন্ডুকতার ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়া বেশি কিছু নন।

লেখক আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রযোজক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:setmanas2020@gmail.com • M. 9830312654

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

এক ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযান

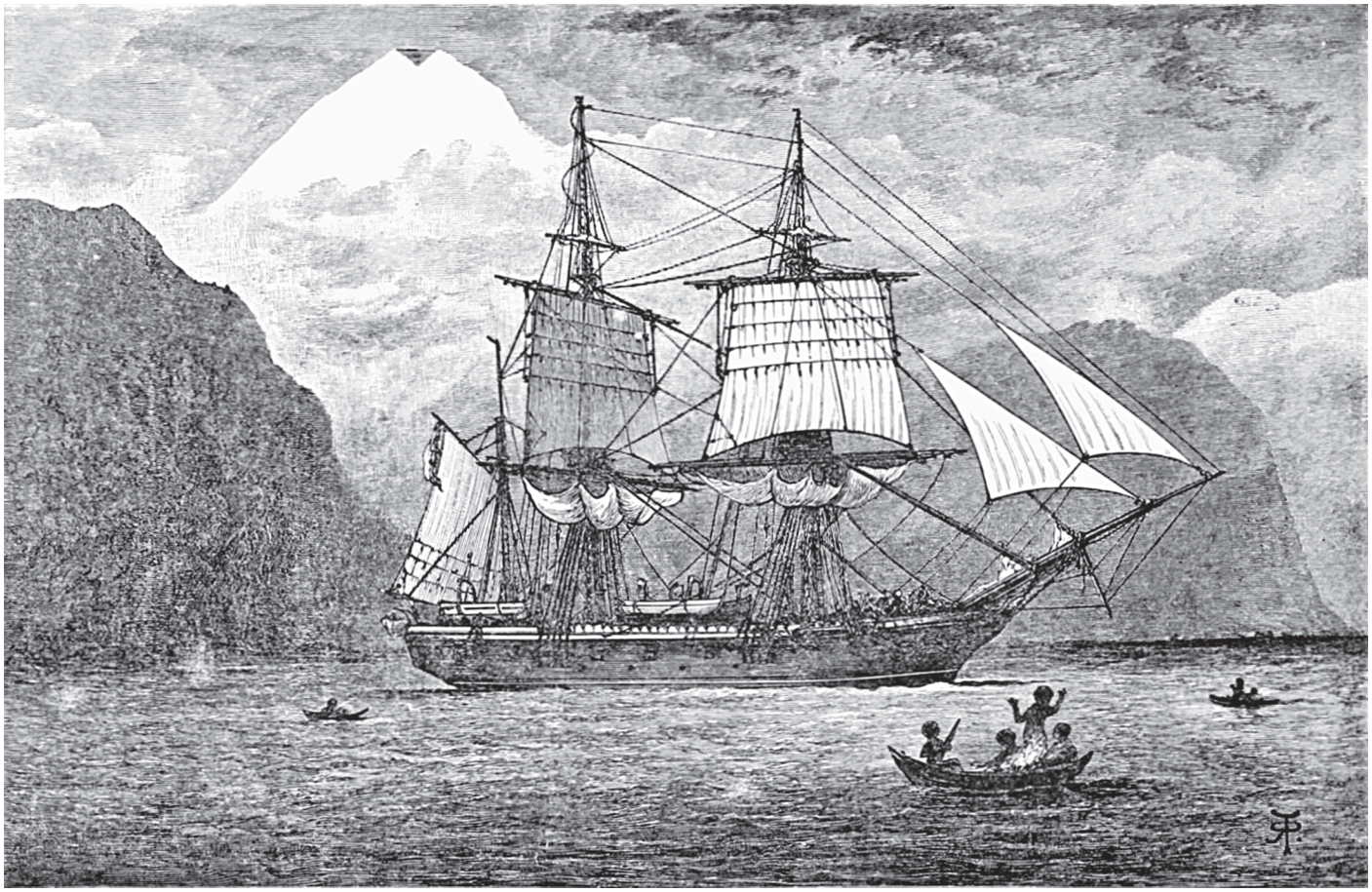

১৮৯০ সালে জন মুরে প্রকাশিত Journal of Researches into the Natural History and Geology বইতে এইচ এম এস বিগ্ল

সেদিন ২৯ অগাস্ট, ১৮৩১ সাল। অধ্যাপক হেন্সলো-এর লেখা চিঠিটি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই হাতে পেয়েছিলেন চার্লস। অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র সে। কেমব্রিজের অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেন্সলো এক সমুদ্র অভিযানের জন্য প্রকৃতিবিদ হিসাবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন। মাস খানেক পরেই ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিৎজরয়-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল জরীপের কাজে এইচ এম এস বিগ্ল নামে জাহাজটি বিশেষ অভিযানে যাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণতম প্রান্ত তিয়েরা দেল ফুয়েগা পর্যন্ত যাবে এই জাহাজ। যদিও কাজটিতে তেমন একটা অর্থের যোগান নেই, তবু এইরকম একটি অভিযানের জন্যই তো এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন চার্লস ডারউইন। অথচ এই কাজে ছেলেকে যেতে দিতে আপত্তি পিতা রবার্ট ডারউইনের। "কী হবে দুবছরের জন্য এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে? অনর্থক সময় নষ্ট করা আরকি!" জোরের সঙ্গে নিজের আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি। এদিকে ২২ বছরের চার্লস মুখিয়ে আছেন অভিযানের জন্য। শেষে এক আত্মীয়ের (চার্লসের দিদি ক্যারোলিনের স্বামী) সুপারিশে রাজি করানো গেলো তাঁর পিতাকে। এমনকি এই অভিযানের জন্য চার্লসকে কিছু অর্থ সাহায্য করতেও রাজি হলেন রবার্ট ডারউইন। এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাচলেন চার্লস। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে তাঁকে। শ্রসবেরি, লন্ডন ও কেমব্রিজের নানা জায়গা ঘুরে তিনি সংগ্রহ করতে থাকেন অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি। গাছপালা ও জীবজন্তুর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের ভূত্বকের গঠন তাঁর আগ্রহের বিষয়। অজানা গন্তব্যে খুঁজে পাওয়া প্রাকৃতিক নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি প্রয়োজনে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষাও করতে হবে বৈকি। তাই সঙ্গে নিয়েছেন কিছু রাসায়নিক, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ও ব্লো পাইপ।

অবশেষে সত্যিই একদিন সাগরে ভেসে পড়ল এইচ এম এস বিগ্ল। সেদিন ২৭ ডিসেম্বর ১৮৩১ সাল। কিছুক্ষণ পর থেকেই মারাত্মক সমুদ্রপীড়া শুরু হল চার্লসের। মোটামুটি শ-চারেক বৈজ্ঞানিক বইপত্রের দারুণ একটা লাইব্রেরি আছে জাহাজে। সেই লাইব্রেরির কেবিনেই ঠাই হয়েছে তাঁর। শরীর খারাপ নিয়েই ভূতত্ত্ব সম্পর্কিত বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখেন তিনি আর অপেক্ষা করেন কবে জাহাজ কোনো বন্দরে এসে ভিড়বে ও পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাওয়া যাবে।

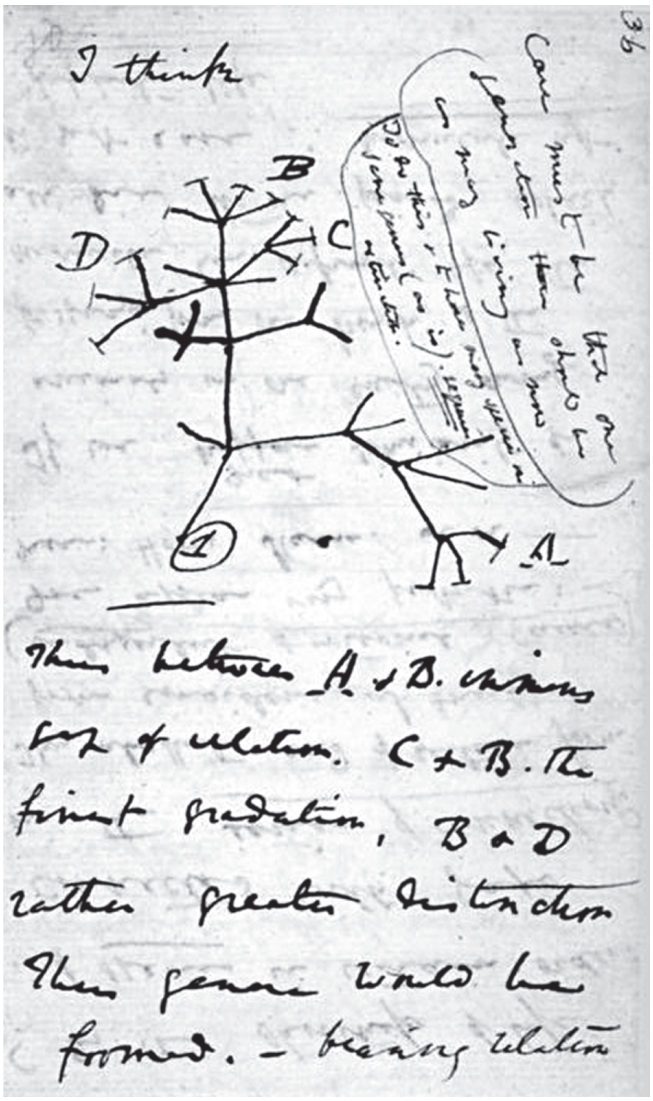

ডারউইনের নোটবুকের পৃষ্ঠা

১৬ জানুয়ারি কেপ ভার্দোতে নোঙর করল বিগল। আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে অবস্থিত এই দ্বীপটি দাস ব্যবসার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দর হয়েই আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় দাস আমদানি করা হয়। জাহাজের অন্যান্য লোকজন কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ডারউইন গোটা দ্বীপ একা একা ঘুরে বেড়ালেন। সমুদ্র বন্দরের কাছাকাছি পাহাড়ের গায়ে চোখে পড়ে সাদা রঙের আঁকাবাঁকা দাগ। মনে হয় যেন শামুখ ও ঝিনুকের খোলা দিয়ে তৈরি এই অঞ্চল। ডারউইনের মনে প্রশ্ন জাগে, এই এলাকা কি তাহলে কখনো সমুদ্রগর্ভে ছিল? তারপর ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে এইরকমটা হয়েছে? হরেক রকমের গাছপালা, ধূসর বর্ণের গিরগিটি জাতীয় এক সরীসৃপ, চড়ুই জাতীয় রঙবেরঙের পাখি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তিনি দেখতে পেলেন জোয়ারের জল জমে থাকা গর্তগুলোতে এক ধরনের আজব মাছ। ক্যাটল ফিশ জাতীয় এই মাছেরা আবার ইচ্ছেমত নিজের রং বদলাতে সক্ষম। অবাক হয়ে যান ডারউইন। এই মাছেদের দেহ এবং আচার আচরণ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সেই সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিত লিখে অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেন্সলোকে এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন ডারউইন। এইভাবেই একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে এক ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর মনন ও বিশ্লেষণী প্রতিভা।

আবার জাহাজে ভেসে পড়া। একদিকে নিজে চোখে দেখেছেন দাস ব্যবসার বীভৎস রূপ। অথচ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্যদের সেসব নিয়ে কোনো হেলদল নেই; ওরা দেখে শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক মুনাফা। এবার মানসিকভাবে আরও একা হয়ে পড়েন ডারউইন। নিজেকে আরও বেশি করে নিয়োজিত রাখেন পড়াশুনা ও পর্যবেক্ষণের জগতে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিন ব্রাজিলে এসে পৌঁছল বিগ্ল। ততদিনে প্রকৃতি অধ্যয়নের সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছেন ডারউইন। স্থানীয় এক সঙ্গী জুটিয়ে গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ান তিনি। সংগ্রহ করেন স্থানীয় লতাগুল্ম ও বিচিত্র পোকামাকড়। চলতে থাকে এসব নিয়ে লাগাতার পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন। স্কেচসহ ডায়রিতে লিখে রাখেন সবকিছু।

জাহাজ এসে ভিড়ল আর্জেন্টিনায়। বিচিত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে প্যাটাগনিয়ার রুক্ষ জমিতে ঘুরে বেড়ান ডারউইন। পর্যবেক্ষণ করেন ভূত্বকের গঠন। খুঁজে বের করেন অতিকায় সব জীবাশ্মের হাড়গোড়। সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন সবকিছু। সেইসব নমুনা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিজের মতামত নিয়মিত ডাকযোগে লিখে পাঠিয়ে যাচ্ছেন অধ্যাপক হেন্সলোর কাছে। ততদিনে অবশ্য ডায়রিতে আড়াইশো পৃষ্ঠার বেশি লেখা হয়ে গেছে তাঁর। মাথায় গিজগিজ করছে হাজারো প্রশ্ন। সবচেয়ে বেশি ধন্দ এই অতিকায় প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে। এত বড়ো কোন প্রাণী তো দক্ষিণ আমেরিকায় নেই! তাহলে কি ওদের নির্মূল হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে পরিবেশের বদল? যদি তাই হয়, তবে কেন ঘটেছিল সেই বদল?

এবার আটলান্টিক মহাসাগর ছেড়ে ম্যাজিলান খাঁড়ি ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল বিগল। ১১ জুন, ১৮৩৪ ওদের জাহাজ এসে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরে। চিলির উপকূল ধরে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেলেন ভালপারাইজোতে। ভারি সুন্দর বন্দর শহর ভালপারাইজোত। এখানে ওদের জাহাজ সারাইয়ের কাজ চলবে কয়েকদিন। আশপাশের গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে সারাদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহ করেন ডারউইন। এদিকে সারাই শেষে জাহাজ চলে গেল কিছুদিনের জন্য উপকূলবর্তী এলাকা সমীক্ষার কাজে। ডারউইন গেলেন না। তিনি এই সময়টা কিলোটা উপত্যকা, বেল মাউন্টেন, সান্তিয়াগো, জাজুয়েলের তামার খনি, কাচাপুয়েলের উষ্ণ প্রস্রবণ, রানকাগুয়া, টাগুয়া-টাগুয়া হ্রদ সহ পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে এই সময় বেশ অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন চার্লস।

অবশেষে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সমীক্ষা শেষে বিগল ফিরে এল ভালপারাইজোতে। ডারউইনকে তুলে নিয়ে জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ওরা এসে নামলেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দ্বীপপুঞ্জ গ্যালাপোগাসে। এখানকার গোটা উপসাগরীয়

অঞ্চল সামুদ্রিক জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঙর, কাছিম কী নেই এখানে। অনেক তিমি শিকারি জাহাজও এদিকে ঘুরে বেড়ায়। আর স্থলভাগে আছে বিশালাকার কচ্ছপ ও দানবীয় সরীসৃপ প্রাণীরা। ডারউইনের মনে হল, এক প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এসে পড়েছেন তিনি। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে ঘুরে সারাদিন নমুনা সংগ্রহ করেন, নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শারীরিক গঠন এবং স্বভাব পর্যবেক্ষণ করেন, তারপর নিজের ডায়রিতে লিখে রাখেন।

আবার জাহজে ভেসে পড়া। এবার ডারউইন এসে পৌঁছোলেন তাহিতি দ্বীপে। প্রকৃতিবিদ হিসাবে নিজের কাজের পাশাপাশি এখানকার লোকজন, তাঁদের আদিম জীবনযাপন, অভ্যাস এবং সংস্কৃতির কথাও নিজের ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেন তিনি। তাহিতি থেকে নিউজিল্যান্ড। ডারউইন মনে করেন দ্বীপপুঞ্জে সভ্যতার আলো এখনো এসে পৌঁছায়নি। তবে ইংরেজ মিশনারিরা এসে পরায় উপজাতিরা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। ওদের সমাজে সর্দারই শেষ কথা বলে, আর কথায় কথায় লেগে থাকে দাঙ্গা। এ এক ভয়ানক হিংস্রতা। এক উপজাতির লোকজন তাঁদের শত্রুপক্ষের সবাইকে নির্বংশ করতে বদ্ধপরিকর। এখানেও কিছু দুর্গম অঞ্চল ঘুরে দেখলেন ডারউইন। সন তারিখ সহ নিজের ডায়রির পাতায় লিখে রাখেন সবকিছু। আবার জাহাজে ভেসে পড়া।

এবার ওঁরা চললেন অস্ট্রেলিয়ার দিকে। জাহাজ নোঙর ফেলল সিডনির পোর্ট জ্যাকসন-এ। ব্রিটিশরা কয়েক দশক আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। উন্নয়নের চিহ্ন সর্বত্র। শেকলে বাঁধা কয়েদিরা অস্ত্রধারী সেপাইদের পাহারায় রাস্তা তৈরির কাজ করছে। এদেশে বৃষ্টির পরিমাণ কম। তাই চাষবাসের কাজ প্রায়ই মার খায়। নিউ সাউথ ওয়েলসে বিস্তীর্ণ চারণভূমির মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন জঙ্গল। প্রচুর ইউক্যালিপটাস গাছ। স্থানীয় অর্ধনগ্ন অ্যাবরিজিনালরা এখনো বর্শা জাতীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে ওদের স্বভাবে সারল্য আছে। মায়া হয় ওদের জন্য। ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৫ ডারউইন নিজের ডায়রিতে লিখলেন—

"মোটের উপর কোনো এলাকায় সাদা চামড়ার লোকজন এসে ঢুকলে সেখানকার স্থানীয় উপজাতিরা খুশিই হয়। ওঁরা শুধু এটা বুঝতে পারে না, আগন্তুকরা ওদের দেশটাকে নিজের সন্তানসন্ততির জন্য ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে"।

ক্যাঙারু, প্ল্যাটিপাস, ইত্যাদি বিচিত্র প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। খুঁটিয়ে লক্ষ করেন অ্যান্ট লায়নদের পিঁপড়ে এবং অন্যান্য পোকামাকড় শিকার করা। তারপর হোবার্ট টাউন ঘুরে ডারউইনকে নিয়ে আবার জাহাজ ভেসে পড়ল সাগরে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিন পৌঁছান গেল কিলিং দ্বীপে (বর্তমান নাম কোকো দ্বীপ)। দ্বীপ বলতে সাগরের বুকে প্রবাল প্রাচীর ঘেরা লম্বা লম্বা জমির ফালি ও তাতে প্রচুর নারকেল গাছ। আর আছে গ্যানেট, ফ্রিগেট, টার্ন, ইত্যাদি নানা প্রজাতির সামুদ্রিক পাখি এবং প্রচুর নারকেলি কাঁকড়া ও সন্ন্যাসী কাঁকড়া। এখান থেকেও প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করলেন ডারউইন।

এবার দেশে ফেরার পালা। ইতিমধ্যে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ নমুনার অধিকাংশই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাহিতি, এইমো ও কিলিং, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রবাল প্রাচীর ঘেরা এই দ্বীপগুলির ভূপ্রকৃতি, এখানে প্রাপ্ত জীবাশ্ম এবং জীবজ উপাদান ডারউইনের ভাবনাচিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছে। ওদের জাহাজ মরিশাস, উত্তমাশা অন্তরীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে এসে হাজির হল জুন মাসের শেষদিকে। তারপর অ্যান্টার্কটিকার কাছাকাছি আগ্নেয়শিলায় তৈরি দ্বীপ অ্যাসেনশান ছেড়ে ব্রাজিলের বাহিয়া ও পেরনামবুকো পৌঁছল বিগ্ল। সবজায়গাতেই ডারউইন নিজের কাজ করে চলেন। তবে এবার দেশে ফেরার জন্য খুব উতলা হয়ে উঠেছেন তিনি। একসময় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায়া বন্দর ছেড়ে রওনা হল বিগ্ল। অবশেষে ২ অক্টোবর, ১৮৩৬ ফলমাউথ বন্দরে এসে নামলেন চার্লস ডারউইন। কতদিন পর পায়ের নীচে দেশের মাটির স্পর্শ! এদিকে রাত হয়ে গেছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বেশ ঝড় উঠেছে। এসবের তোয়াক্কা না করে সেই রাতেই ডাকগাড়ি ধরে শ্রসবেরির দিকে রওনা হলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে যে যুবক ঘর ছেড়ে অজানার পথে জাহাজে উঠে বসেছিলেন এখন তাঁর বয়স সাতাশ। লম্বা পথ পারি দিয়ে যেমন ভরে উঠেছে অভিজ্ঞতার ঝুলি তেমনি প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলিয়ে এই দীর্ঘ সময়ে মোট ৫৪৩৬ টি নমুনা সংগ্রহ করেছেন তিনি। সেগুলিকে শুকিয়ে এবং অ্যালকোহলে চুবিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সঙ্গে ৭৭০ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা অভিযানের ডায়রির পাশাপাশি সংগৃহীত নমুনাদের নিয়ে লিখে ফেলেছেন ৩৬৮ পৃষ্ঠার বিবরণ।

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে বিভিন্ন জীবের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও যোগ্য প্রজাতির টিকে থাকার যুগান্তকারী তত্ত্বের অবতারণা ডারউইন করেছিলেন এই অভিযানের ভিত্তিতেই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে আমাদের এই চেনা পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত একমুখী অন্ধবিশ্বাসের ধর্মীয় আবহে বিবর্তনবাদের চিন্তা আমদানি করা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। তবে নিজের অভিজ্ঞতা, বিপুল পরিমাণ সংগৃহীত নমুনা, সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে সমস্ত তথ্য ও যুক্তি খাড়া করতে অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। অবশেষে ১৮৫৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা মহাকাব্যিক গ্রন্থ 'অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন'। শোনা যায় প্রকাশের দিনই নাকি শেষ হয়ে গিয়েছিল বইটির প্রথম সংস্করণ। তারপর ১৮৭২ সাল পর্যন্ত মোট ছয়টি সংস্করণ হয়েছিল সেই বইয়ের। তুমুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এই বইকে নিয়ে বিতর্কের খামতি ছিল না মোটেই। তবে সেই কথা আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমরা শুধু ফিরে দেখলাম ডারউইনের সেই ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযানের দিকে, যে অভিযান বদলে দিয়েছিল বৈজ্ঞানিক ভাবনার দিশা।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: acnbu@gmail.com • M. 8967965340

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

নৈঃশব্দের অধিকার

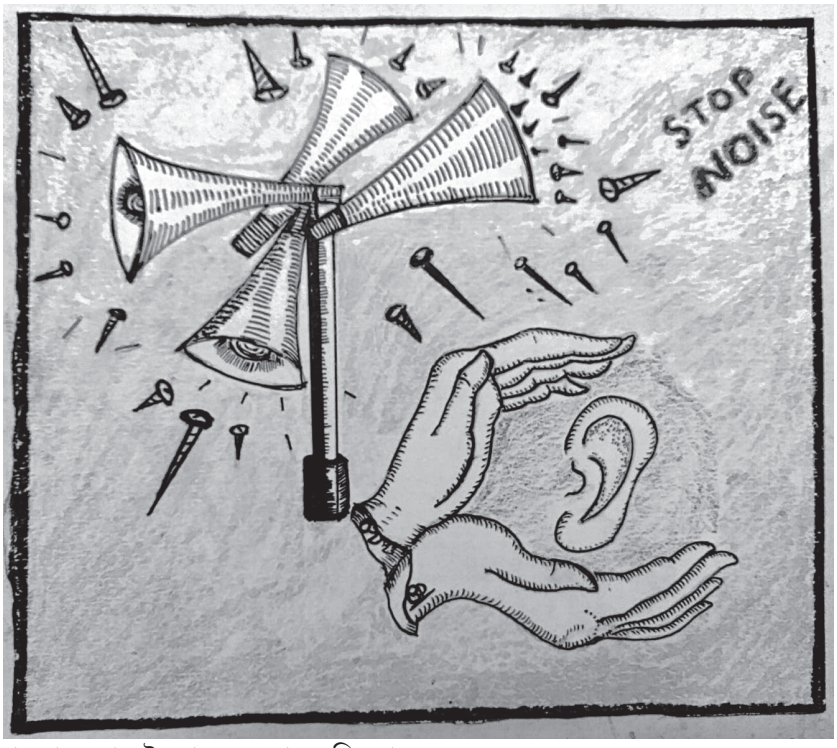

পৃথিবী জুড়ে শব্দের নিরন্তর খেলা। সমুদ্রে ঢেউয়ের গর্জন, নদীতে জলের কলতান, আকাশে মেঘের নিনাদ---সমস্ত জীবজগৎ পরস্পরকে শব্দের বিন্যাসে আহ্বান করে; শব্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শব্দেরই মাধ্যমে। সুরকারগণ চলমান প্রকৃতি মেনেই সুরের সন্ধান করেন; সেই সুর গানের মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তাকে চমৎকৃত করে, বিনোদনের জগৎকে দেয় মাত্রা। সাহিত্যিক প্রকৃতির নিরন্তর শব্দের চঞ্চলতাকে সাহিত্যের ক্যানভাসে তুলে ধরেন। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীবজগৎ শব্দ আর নৈঃশব্দের জগতে বিচরণ করে শারীরিক তথা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে।

তাই একথা অনস্বীকার্য, শব্দের সুচারু প্রয়োগ সমস্ত জীবজগতের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু 'শব্দ' ধীরে ধীরে মানুষের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। আর তা মানুষেরই জন্য। মাইক্রোফোনের অপব্যবহার মানুষকে 'বাধ্যতামূলক শ্রোতা'তে পরিণত করল। কারখানার যন্ত্রের আওয়াজ শ্রমিককে বধিরতা উপহার দিল। মোহময় 'শব্দজগৎ' মানুষের জীবন থেকে ক্রমে ক্রমে মুছে গেল। এককথায়, অবাঞ্ছিত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করল 'শব্দদানব'। শব্দদানবের অত্যাচারে ঘটে গেল নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা।

• এখন থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এক কালীপূজোর রাতে দিল্লির বুকে একটি মেয়ের উপর কিছু দুষ্কৃতি শারীরিক অত্যাচার করার জন্য সচেষ্ট হয়। সাহায্যের আশায় মেয়েটি যথাসাধ্য চিৎকার করে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে কিন্তু কালীপূজোর রাতে প্রচন্ড শব্দবাজির কারণে কেউই মেয়েটির চিৎকার শুনতে পায় না, দুষ্কৃতিরা অবাধে মেয়েটির উপর শারীরিক অত্যাচার চালায় এবং মেয়েটি চরম লাঞ্ছিত হয়। পরের দিন নিরুপায় মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

• বেশ কয়েক বছর আগে শেওড়াফুলি এলাকায়, কতিপয় সমাজবিরোধী কালীপূজোর রাতে শব্দবাজির ব্যাপক তান্ডব আরম্ভ করে। অবস্থা ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠায়, এক স্থানীয় যুবক গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করে শব্দবাজির অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিছুক্ষণের জন্য সমাজবিরোধীরা পিছু হটে কিন্তু পরের দিন সকালে দুষ্কৃতিরা দলবদ্ধভাবে যুবকটিকে আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। দীর্ঘ বিচারের পর আসামীরা নির্দোষ বলে ঘোষিত হয় উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে যুবকটির বাবা-মায়ের কাছে অনুরোধ জানানো হয় যে তাঁদের আরও একটি সন্তান আছে এবং বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলে, তাদের সেই সন্তানের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। শব্দবাজির প্রথম শহীদের বাবা-মায়ের সামনেই তাঁদের সন্তানের হত্যাকারীরা আজও অবাধে বিচরণ করছে।

• বেশ কয়েক বছর আগে, পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি অঞ্চলে এক গ্রামে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি স্থানীয় যুবকদের শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, প্রবল বাদানুবাদ হয়, স্থানীয় যুবকরা ঐ ব্যক্তিকে মারধোর করে এবং ব্যক্তির মৃত্যু হয়। শব্দবাজি ব্যবহারের প্রতিবাদ করার জন্য তিনি হলেন দ্বিতীয় শহীদ। বিচারের জন্য বিষয়টি মহামান্য আদালতের সামনে পেশ করা হয়, বিচার চলছে, অপরাধীরা অবশ্য জামিনে মুক্ত। প্রৌঢ় ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানেরা আজও বিচারের অপেক্ষায়।

• কয়েক বছর আগে এক কালীপূজোর রাতে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কন্ট্রোল বোর্ডে খবর এল পি জি হসপিটালের ভিতর উচ্চস্বরে মাইক বাজানো চলছে। পর্ষদের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন মাইকে গান বাজানো চলছে উচ্চস্বরে এবং রোগীরা ছটফট করছে ভয়ঙ্কর শব্দের অত্যাচারে। পর্ষদের আধিকারিকদের প্রায় দেড় ঘন্টার প্রয়াসের পর পুলিশ আসে এবং মাইক বাজানো বন্ধ হয়। স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সংশ্লিষ্ট পূজার এক কর্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপর বেশ কয়েক বছর পি জি হসপিটালের ভিতর উচ্চস্বরে মাইক বাজানো বন্ধ ছিল। কিন্তু আবার নতুন করে শুরু হয়েছে শব্দদৈত্যের অত্যাচার উচ্চস্বরে মাইক বাজানোর মাধ্যমে। রোগীরা ছটফট করছে কিন্তু ওরা অসহায়।

• কয়েক বছর আগে কালীপুজোর রাতে দেখা গেল ন্যাশনাল

মেডিকেল কলেজের নার্সেরা ডিউটি করছেন কানে তুলো দিয়ে। হসপিটালের মধ্যে প্রচন্ড শব্দবাজির কারণে পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছে যে বাজির শব্দে পুরো এলাকাটাই বারে বারে কেঁপে উঠছে। পর্ষদের আধিকারিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে কিনা। উত্তরে নার্সেরা জানালেন প্রতি বছর এরকমটাই হয়ে থাকে এবং তারা কানে তুলো দিয়েই ডিউটি করেন, এটাই তাঁদের অভ্যাস।

• কালীপূজোর রাতে (২০০৯) ডঃ বিধান চন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালের ভিতর চারদিকের বিভিন্ন ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে অনবরত বাজি ফেলা হতে থাকে। শিশুরা শব্দের তান্ডবে কেঁপে উঠতে থাকে, স্যালাইনের ছুঁচ খুলে যেতে থাকে, নার্সেরা অসহায়, নিরুত্তর। অনেক খুঁজে হসপিটাল সুপারকে পাওয়া যায়নি। শিশুদের অভিভাবকরা নিরুপায় হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান, পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, কিছুক্ষণ পরেই আবার শুরু হয় শব্দদৈত্যের অত্যাচার। অসহায় শিশুদের কষ্ট লাঘব করার জন্য কিছু করা গেল না।

• ২০১০ সালেও শব্দবাজির অনিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ করার জন্য মৃত্যুকে এড়ানো গেল না। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বীজপুর থানার অন্তর্গত হালিশহরের বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়স্কা ভদ্রমহিলা বকুল অধিকারী তাঁর বাড়ির সামনে শব্দবাজি ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। কতিপয় উদ্ধত যুবক শব্দবাজির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মেনে নিতে পারেনি। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে মাটিতে ফেলে মারধোর করে, ফলতঃ ঐ বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার মৃত্যু হয়। পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের সম্মান দেওয়ার একটা সংস্কৃতি বহুদিন ধরেই প্রচলিত রয়েছে। বুকল অধিকারীর মৃত্যুতে বহুদিন ধরে লালিত এই সংস্কৃতিকে ঘিরে এক অদ্ভুত আঁধার ঘনিয়ে এল।

• ২০১৩ সালে অশোক নগর ২৪ পরগণা উত্তরে পিন্টু বিশ্বাস শব্দবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহিদ হয়ে গেলেন। পিন্টু বিশ্বাসের কয়েকজন খুনি আজও অধরা। তার বিধবা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন কবে তার স্বামীর হত্যাকারীরা সাজা পাবে। প্রশাসন নির্বিকার।

কিন্তু এই শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই মানুষই আবার সৃষ্টি করল নানাবিধ আইন। আইনের সুচারু প্রয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত এক বিচারের বাণীর মধ্য দিয়ে। ঘোষিত হল কোন মানুষ কোন মানুষকে বন্দি বা দাস শ্রোতাতে পরিণত করতে পারবেন না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেমন আবশ্যিক গণতন্ত্রের স্বার্থে, সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে, ঠিক তেমনি কোন কিছু শুনতে না চাওয়াও জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। মানবজীবনে শব্দের প্রয়োজন যেমন আবশ্যিক ঠিক তেমনি নৈঃশব্দ জীবনের অপরিহার্য সঙ্গী। বিগত ১৯৯৬-র এপ্রিলে মাননীয় বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক ঐতিহাসিক তথা গুরুত্বপূর্ণ রায় দান করেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ঐতিহাসিক রায়কে সুরের অসুর নিধনে এক অমোঘ বাণীরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হয়ে উঠেছেন শব্দদূষণের বিরুদ্ধে সচেতন। বাস্তবিকই এই রায় আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিচারপতির এই রায় সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে। তাই একে কার্যকরী করা আজ অত্যন্ত জরুরী। সমাজের সকল স্তরের মানুষের দৃঢ় মানসিকতা আগামীদিনে এই রায়কে কার্যকরী করতে সাহায্য করবে।

তারপর সবটাই ইতিহাস। শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ন্যায়ালয়ের একের পর এক রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বিষয়টি নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং তার ফলস্বরূপ ২০০০ সালে প্রণয়ন করা হয় শব্দদূষণ সংক্রান্ত নতুন আইন। সেই আইনের বিভিন্ন ধারাগুলি হল—

[নয়েজ পলিউশান (রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) রুলস, ২০০০] — শব্দদূষণ (প্রনিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ২০০০। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) আইনের ভিত্তিতে প্রবর্তিত এই বিধির প্রধান উদ্দেশ্য শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ। মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপই শব্দদূষণের প্রধান কারণ। নগরায়ন শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির প্রগতি, পরিবহনের প্রসার এবং মানুষের জীবন প্রণালিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই সুরবর্জিত শব্দদূষণের কারণ। আধুনিক মানব সভ্যতার উপজাত হিসাবে শব্দদূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রধান পরিবেশ দূষক হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এলাকার কোড	এলাকার শ্রেণিকরণ	নির্ধারিত শব্দমাত্রা dB(A) Leq	
		দিবা সময়	রাত্রি সময়
এ	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০
বি	বাণিজ্যিক এলাকা	৬৫	৫৫
সি	বসতি এলাকা	৫৫	৪৫
ডি	শব্দনিষেধ এলাকা	৫০	৪০

মন্তব্য :

ক) দিবা সময় সকাল ছয়টা থেকে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত।

খ) রাত্রি সময় রাত্রি নয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত।

গ) হাসপাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র বা আদালতের একশ মিটারের ভেতরের এলাকাকে শব্দনিষেধ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। যোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা শব্দনিষেধ এলাকা ঘোষিত হয়।

ঘ) মিশ্র শ্রেণির যোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপরিউক্ত শ্রেণিগুলির মধ্যে একটি ঘোষিত করা হবে এবং সেক্ষেত্রে তার প্রতিসঙ্গী মান প্রযোজ্য হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু বিশেষ নির্দেশিকা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

উৎসবের আনন্দকে বজায় রাখতে নিয়ম মেনে সাউন্ড লিমিটার সহ মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে।

♦ শব্দবর্জিত অঞ্চলে কোন প্রকার শব্দদূষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও হাসপাতালের চারিদিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা শব্দ বর্জিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলে হর্ণ বাজানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

- নির্ধারিত সময়সীমা এবং প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না রাত দশটার পর ও সকাল ছটার আগে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- উচ্চ বিস্ফোরক শব্দযুক্ত বাজি বা পটকার (চকলেট বোমা, দোদোমা, কালিপটকা প্রভৃতি) উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনারেটর সেট পর্ষদের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে ও শব্দ নিয়ন্ত্রক বেষ্টনি ব্যবহার করা আবশ্যিক।
- যানবাহনে এয়ার হর্ণ তৈরি, ব্যবহার, বিক্রয় এবং মজুত আইনত নিষিদ্ধ।
- পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলগুলিতে লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না।
- সার্বিক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সজাগ থাকা দরকার।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'শব্দমুক্ত' সপ্তাহ পালিত হল কিন্তু শব্দের অত্যাচার অব্যাহত। শারদীয়া উৎসব থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত বাজবে মাইক উচ্চস্বরে, শব্দবাজি ব্যবহার হবে নিয়ম ভেঙে। কেবলমাত্র পূজা পার্বণে নয়, সমস্ত রকম মেলা, খেলা পিকনিকে ডিজের শব্দ অত্যাচার কমানো যাচ্ছে না। তবু চেষ্টা করতেই হবে, নৈঃশব্দের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। শব্দদানব এক সময় পশ্চিমবঙ্গের বুকে বোতলবন্দি হয়েছিল কিন্তু সে আবার বোতলের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শব্দদানবকে বোতলবন্দি করার জন্য নাগরিক আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, প্রশাসনকে সক্রিয় হবার জন্যে আবেদন করেছেন। শব্দদানব যদি বোতলবন্দি না হয় তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে আরও অনেক শব্দ শহীদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ থেকে আজ পর্যন্ত বারোজন শব্দশহীদ হয়েছেন, যদিও একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই দোষীরা শাস্তি পাননি। দোষীদের দ্রুত শাস্তি ও শব্দশহীদদের ক্ষতিপূরণের জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, তবু জারি থাকে নাগরিক আন্দোলন। সরকারি উদ্যোগে 'শব্দমুক্ত' সপ্তাহ পালিত হয়, উৎসবে বাজবে মাইক উচ্চস্বরে, শব্দবাজি ব্যবহার হবে নিয়ম ভেঙে। তবু চেষ্টা করতেই হবে, নৈঃশব্দের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। শব্দদানব এক সময় পশ্চিমবঙ্গের বুকে বোতল বন্দি হয়েছিল কিন্তু সে আবার বোতলের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শব্দদানবকে বোতল বন্দি করার জন্য নাগরিক আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, প্রশাসনকে সক্রিয় হবার জন্যে আবেদন করেছেন। শব্দদানব যদি বোতল বন্দি না হয় তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে আরও অনেক শব্দ শহিদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ থেকে আজ পর্যন্ত ১৫ জন শব্দ-শহিদ হয়েছেন, যদিও একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই দোষীরা শাস্তি পায়নি। দোষীদের দ্রুত শাস্তি ও শব্দ-শহিদদের ক্ষতিপূরণের জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, তবু জারি থাকে নাগরিক আন্দোলন।

পরিবেশ ও সমাজকর্মী, আইনজীবি ও লেখক

email: biswajit.envlaw@gmail.com • M. 8420762517

বিজ্ঞানের খবর

চাঁদের নিচে আলোকিত শুক্র

২৪ মার্চ শুক্রবার। সন্ধ্যায় অনেকেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছেন। চাঁদের নিচে কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে। কী ওটা? কেউ বলেছেন, ওটা ভিনগ্রহী প্রাণীর স্পেসশিপ তবে যাদের কল্পনায় সামান্যতম যুক্তি আছে, তারা ওটাকে নক্ষত্রও ভেবেছেন।

চাঁদের ঠিক নিচে আলোকিত বস্তুটি একটি গ্রহ। হ্যাঁ, আমাদের সৌরজগতেরই গ্রহ। চাঁদের পরে সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। ঠিকই ধরেছেন, ওটা শুক্র গ্রহ। এ সময় সম্পূর্ণ চাঁদের ৯ শতাংশ দেখা গেছে।

কিন্তু শুক্র গ্রহকে কেন চাঁদের ঠিক নিচে আসতে হল? কারণ সৌরজগতের সব বস্তুই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঘোরার সময় মাঝেমধ্যে পৃথিবীর কাছে চলে আসে। ঠিক তখনই চাঁদও পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুতে ঐ গ্রহদের সঙ্গে একই সরলরেখায় চলে আসতে পারে। অর্থাৎ ২৪ মার্চ শুক্র যখন পৃথিবীর কাছে এসেছিল, ঠিক তখন চাঁদ ও শুক্র

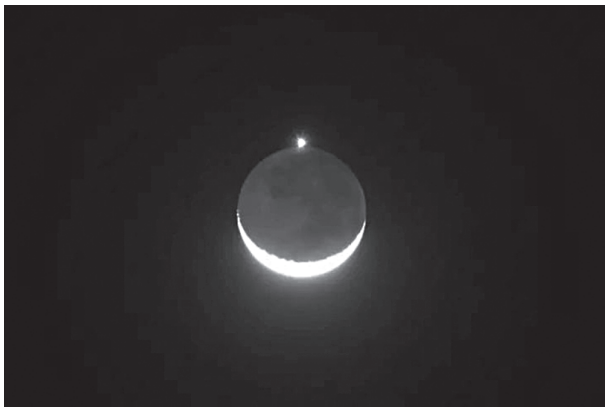

ছিল একই সরলরেখায়। ফলে চাঁদের ঠিক নিচেই দেখা গেছে শুক্রকে। আগেই বলেছি চাঁদ ও শুক্র গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। তাই এই দুটি কাছাকাছি এলেও এদের আলো ঠিক পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা গেছে।

খুব বেশি সময় অবশ্য এই দৃশ্য দেখতে পারেনি পৃথিবীবাসী। কারণ, চাঁদ, শুক্র গ্রহকে প্রায় ২ ঘন্টা ঢেকে রেখেছিল। এটাকে শুক্র গ্রহণও বলা যায়।

(পত্রিকা বিজ্ঞান চিন্তা থেকে সংগৃহীত)

ড. বরুন কুমার দত্ত

মহাকর্ষ সর্বদা আকর্ষণধর্মী কেন?

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কয়েকটি বিষয় একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। নিউটনের সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্বজনীন মহাকর্ষ সূত্রের কথা আমাদের জানা। এই সূত্রে মহাকর্ষকে (পৃথিবীর ক্ষেত্রে অভিকর্ষ) এক ধরনের আকর্ষণধর্মী বল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। গাছের ফল মাটিতে পড়া থেকে শুরু করে, জোয়ার ভাঁটা, গ্রহ উপগ্রহ ও বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতিবিধি এই সূত্রের সাহায্যে সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

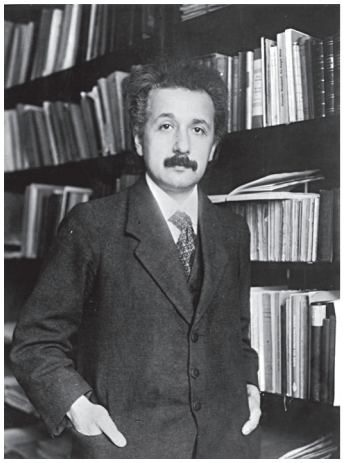

আইনস্টাইন

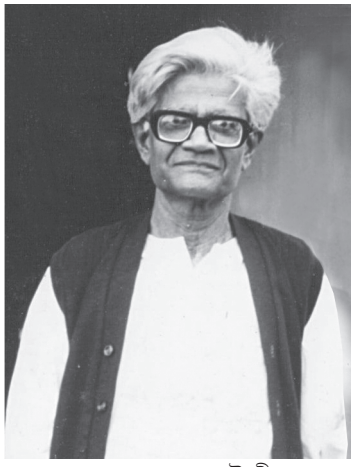

অমল কুমার রায়চৌধুরী

গ্রহ, উপগ্রহদের কক্ষপথ কেনই বা উপবৃত্তাকার সেটা জানা গেল ঐ সূত্রের সাহায্যেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস এই তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া যায়। মূলত নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যেই নির্ভুলভাবে বলা যায় গ্রহণের দিনক্ষণ, প্রকৃতি (আংশিক বা পূর্ণ) এবং স্থায়িত্ব (Duration) ইত্যাদি বিষয়।

কিন্তু তা সত্ত্বে কয়েকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমত মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের এই টানাটানি কেন হচ্ছে? অর্থাৎ আকর্ষণধর্মী মহাকর্ষ বলের উৎস কী—সেটি নিউটনের তত্ত্বে পাওয়া যায় না। আর দ্বিতীয়ত, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে রয়েছে দূরত্বের কথা, যেহেতু দূরত্বের সঙ্গে সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, অথচ সেখানে সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। অর্থাৎ নিউটনের মতে, মহাকর্ষের আকর্ষণ একটা তাৎক্ষণিক (Instantenious) ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশীল। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে দূরত্ব ও সময় পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তারা রয়েছে চতুর্মাত্রিক দেশকালের জ্যামিতির মধ্যে। এছাড়াও শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ একটি ধ্রুবক রাশি (C), তাহলে নিউটনের মহাকর্ষের প্রভাব আলোর গতিবেগকে ছাড়িয়ে যায় কিভাবে?

এইসব প্রশ্নগুলির প্রেক্ষাপটে ১৯১৫-১৬ সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। তিনি নিউটনের মহাকর্ষ মানেই আকর্ষণ বল, এই ধারণাটাই পাল্টে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ষ কিভাবে ও কেমন করে ক্রিয়াশীল হয়, সাধারণ অপেক্ষবাদ তারই বর্ণনা করে। মহাকর্ষ শুধুমাত্র দুটি ভরের উপর ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল নয়। এটা আসলে বস্তুর উপস্থিতিতে তার চারপাশের দেশকাল দুমড়ে মুচড়ে (Wraped) বা দলা পাকিয়ে যাওয়ার ফল। অর্থাৎ ভারী বস্তুর প্রভাবে ঐ অঞ্চলে দেশকালের এক ধরনের জ্যামিতিক বিকৃতি ঘটে, সেই বক্রক্ষেত্রে যে পথ তৈরি হয়, অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত হালকা বস্তু ওই অঞ্চলে এলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বস্তুটি সেই পথেই যায়। ঐ বিশেষ পথটি হালকা বস্তুটির কাছে সহজ ও সংক্ষিপ্ত (Shortest) পথ—সে পথের নাম জিওডেসিক (Geodesic)। বলা বাহুল্য বস্তুর ভর যত বেশি হবে সেটি দেশকালকে তত বেশি বাঁকিয়ে দেবে, যেটা বোঝা যাবে ঐ ভারী বস্তুর নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকর্ষের এক নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

এবার মূল প্রসঙ্গে আলোচনা। আগেই বলা হয়েচে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তার কারণ অতি ভারি সূর্য তার চারপাশের জায়গা (দেশকাল) বাঁকিয়ে দেয়। এইরকম বাঁকা পথে সরলরেখায় চলা যায় না, তারা চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে বাধ্য হয়। এই পথে তাদের চালাতে কোনো বলের ভূমিকা নেই।

রায়চৌধুরির গবেষণা

ভারতীয় বিজ্ঞানী অমল কুমার রায়চৌধুরী সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে ১৯৫৫ সালে আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত রায়চৌধুরি সমীকরণ। সময়ের সাথে এই চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্ব কিভাবে বিবর্তিত হয়, রায়চৌধুরি সমীকরণ তারই ব্যাখ্যা দেয়। এখন প্রশ্ন হল, মহাকর্ষ সর্বদা আকর্ষণধর্মী কেন? আইনস্টাইনের ব্যাখ্যায় মহাকর্ষ দেশকালের একটা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য। তাহলে এই জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই আকর্ষণধর্মিতার ব্যাখ্যা। আগেই বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের বলের প্রভাব ছাড়া একটা বস্তু যে পথে গতিশীল, তাকে বলা হয় জিওডেসিক। রায়চৌধুরি তার গবেষণায় দেখান যে কোনো ভারী বস্তুর উপস্থিতিতে তার চারপাশের জিওডেসিকগুলো ঐ ভারী বস্তুটির দিকে বেঁকে যায় বা ঝুঁকে থাকে। যার ফলে মহাকর্ষ সব সময় আকর্ষণ করে। এটাই হল মহাকর্ষের আকর্ষণধর্মিতার সহজ ব্যাখ্যা।

পরবর্তীকালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজ এই সমীকরণের সাহায্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। এই সম্পর্কিত কৃষ্ণগহ্বরের (Black hole) গবেষণার জন্য পেনরোজ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

Space, time and gravitation have no separate existence from matter. –A. Einstein

তথ্যসূত্র

1. জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ সংখ্যা, June (2016)
2. Gravity–G. Gammow, Dover Publications (2002)
3. আইনস্টাইনের বিশ্ব—শঙ্কর সেনগুপ্ত, বেস্টবুকস (2005)
4. Relativity, the special and general theory–Albert Einstein, Woodpecker (2018)

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও গবেষক এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: drbkdm@gmail.com • M. 9433775743

অ নি র্বা ণ মা ন্না

সভ্যতার বিবর্তন : হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার

সালটা ছিলো ১৯২৪, তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর...

'The Illustrated London News'-এর হেডলাইন-টা চোখে পড়তেই গোটা বিশ্বের চক্ষু চড়ক গাছ....বলে কি ! গোটা বিশ্ব তোলপাড় হওয়ার জোগাড়। এ যে এক নতুন সভ্যতার আবিষ্কারের খবর! যা কি না সমকালীন মিশর কিংবা সুমেরীয় সভ্যতার থেকে স্বতন্ত্র ও বহুগুণে আধুনিক, যা ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্বকে এক ধাক্কায় পিছিয়ে দিল আরো প্রায় চার হাজার বছর পিছনে।

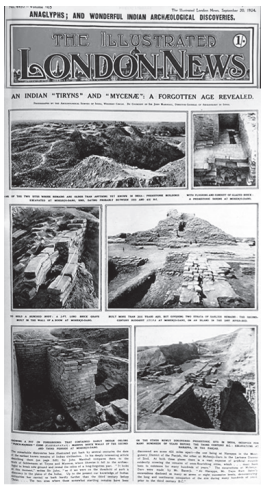
ANAGLYPHS; AND WONDERFUL INDIAN ARCHÆOLOGICAL DISCOVERIES.

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS

AN INDIAN "TIRYNS" AND "MYCENÆ": A FORGOTTEN AGE REVEALED.

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল তাই তো ঘোষনা করলেন... নাহ আর 'বৈদিক সভ্যতা' নয়, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব গাঁথা আছে আরো গভীরে, যা এতদিন মাটির নিচে চাপা ছিল, আজ তা জনসমক্ষে। সিন্ধু নদীর তীরে আবিষ্কৃত হওয়ায় স্যার জন মার্শাল সভ্যতার নাম দিলেন— 'THE INDUS VALLEY CIVILIZATION'. প্রথমদিকে সভ্যতার নাম 'THE INDUS VALLEY CIVILIZATION' হলেও পরে সভ্যতার বিস্তার ও ব্যাপকতা, লক্ষ্য করে সভ্যতার নাম, প্রথম আবিষ্কৃত শহর (হরপ্পা)-এর নামে নামকরণ করা হয় 'THE HARAPPAN CIVILIZATION'. অগত্যা জন মার্শালের এই ঘোষণা, ইতিহাসের হাজার হাজার বই-কে পাঠাল Reprint-এ আর তোমাদের পাঠসূচীতে যুক্ত হলো, আরো একটি অধ্যায়— 'হরপ্পা সভ্যতা'।

যাইহোক, সভ্যতার আবিষ্কারে তৎকালীন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটন করেন দয়ারাম সাহানী ১৯২১ সালে হরপ্পা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে, ঠিক তার পরের বছর বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে বের করলেন আরও একটি জমকালো শহর 'মহেঞ্জোদারো'।

বলা বাহুল্য যে, যদিও ভারত ইতিহাসে 'দ্য ফাদার অফ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'— আলেকজান্ডার কানিংহাম কে বলা হয়, তবুও হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের সময় খনন কাজ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্যার জন মার্শাল। যদিও ভাগ্যদেবী আলেকজান্ডার কানিংহাম কেও যে সেই সুযোগ দেননি সেটা বলা ভুল হবে। কারণ, কানিংহামেরই প্রথম সুযোগ হয়, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তাকে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলমোহর তাকে উপহার হিসেবে দেন। তিনি আবিষ্কৃত কিছু সীলমোহরের ছবিও 'The Illustrated London News' পত্রিকায় প্রকাশ করলেও, সেটার গুরুত্ব এবং সময়সূচী নির্ধারণ করতে তিনি বিফল হন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় ইতিহাসে উপত্যকার নগর সমূহের সাথেই প্রথম শুরু হয় তাই তার পক্ষে হরপ্পা সভ্যতা তাৎপর্য বুঝিয়ে ওঠা হয়ে ওঠেনি।

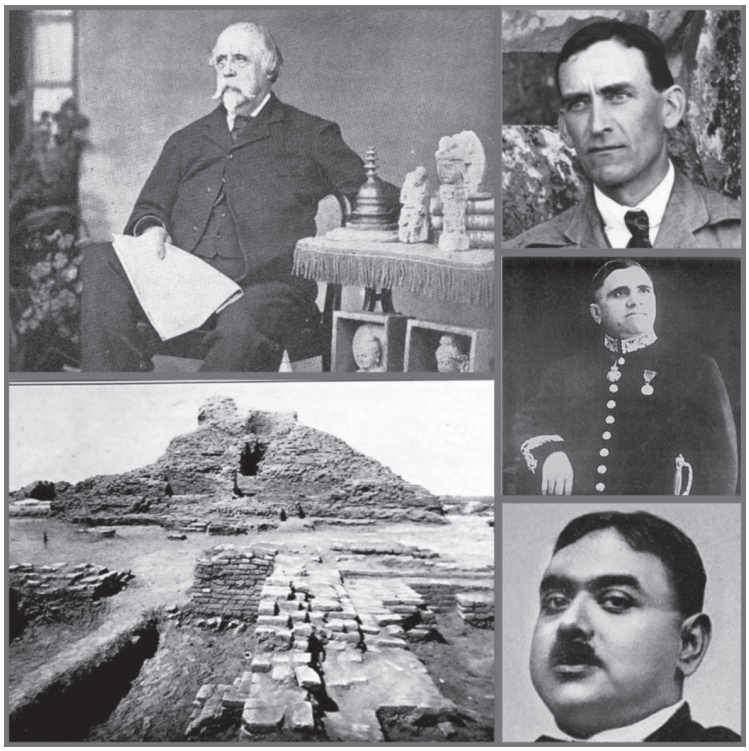

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ

আলেকজান্ডার কানিংহাম এর কাছে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের সুযোগ বিফলে গেলেও, সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন স্যার জন মার্শাল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে বসেন। তাঁরই আমলে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বিভাগে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয় তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে কর্মরত প্রথম পেশাদার পুরাতত্ত্ববিদ যিনি তার কর্ম অভিজ্ঞতাকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কাজে লাগান।

যদিও সভ্যতার নতুন শহর আবিষ্কারের কাজটি একদিনে হয়নি, এর পিছনে ছিল প্রচুর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দয়ারাম সাহানি এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মত কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ। কেননা ১৮২৬ এ চার্লস ম্যাসন প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পাঞ্জাবের শাহীওয়াল জেলার অবস্থিত হরপ্পা টিলার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তারপর আলেকজান্ডার বারন্স, পরে ১৮৫৩ আলেকজান্ডার কানিংহাম, এমনকি ১৮৫৬ তে করাচি থেকে লাহোরে রেললাইন তৈরীর জন্য জন ব্রন্টন এবং উইলিয়াম ব্রন্টন হরপ্পার টিলা থেকে প্রাপ্ত ইট-কে ব্যবহার করেন। ১৯১২ তে জে. ফ্লিট 'দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি'-তে সভ্যতার উপর লেখা প্রতিবেদনে প্রকাশ করলেও সভ্যতার মাহাত্ম্যকে আবিষ্কার

করতে বিফল হন এঁরা সকলেই। অবশেষে সাফল্যের শিকে ছেঁড়ে দয়ারাম সাহানি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কপালে। যদিও বলা বাহুল্য, হরপ্পায় দয়ারাম সাহানি-র আগে অনেকে গেলেও, মহেঞ্জোদাড়ো-তে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি, ঐ অঞ্চলে গেছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে।

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়ো শহরের আবিষ্কারের পরপরই পুরো উদ্যোমে খোঁড়াখুঁড়ি চলতে থাকে, যার ফলস্বরুপ এখনো পর্যন্ত সভ্যতার অন্তর্গত ২৮০০ জায়গায় আমরা নতুন স্থানের আবিষ্কারের সন্ধান পেয়েছি। এগুলির মধ্যে কিছু স্থান 'প্রাকহরপ্পান' (৩২০০-২৬০০ B.C), কিছু স্থান 'পরিণত হরপ্পান' (২৬০০-১৯০০ B.C) এবং আরো কিছু স্থান যেগুলো 'পরবর্তী হরপ্পান' (১৯০০-১৩০০ B.C) কে নির্ধারিত করে। আবার এমন কিছু স্থান আছে যেগুলি সভ্যতার তিনটি স্তরের-ই প্রতিনিধিত্ব করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সুরকোটডা, মান্ডা, রাখিগড়ি, ধোলাবিরা, বানওয়ালি। আর গোটা সভ্যতার মধ্যে কেবল ৭ টি স্থানের কপালে জুটেছে 'নগরত্ব'-এর তকমা। যার মধ্যে রয়েছে- হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারও, কালিবঙ্গান, বানওয়ালি এবং ধোলাবিরা।

হরপ্পা সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব বস্তু

যদিও 'দ্য স্টোরি অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি' গ্রন্থে S.N.Roy লেখেন-মার্শাল ভারতবর্ষকে যেভাবে পেয়েছেন তার থেকে তিন হাজার বছর প্রাচীন হিসেবে ভারতকে রেখে যান এর কারণ হলো তখন পর্যন্ত একই প্রকার অশনাক্ত সীলমোহর মেসোপটেমিয়ায় খনন স্থানে পাওয়া যায়, ফলে সমগ্র বিশ্ব শুধুমাত্র একটি নতুন সভ্যতার কথাই জানতে পারে তা নয় সেই সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার মত আরেক সমকালীন এক নতুন সভ্যতার কথা জনসমক্ষে উঠে আসে।

জেনে রাখা ভাল—

বিশেষ তথ্য	হরপ্পা	মহেঞ্জোদাড়ো
অবস্থান	পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টেগোমারি জেলার রাভী নদীর তীরে বাম দিকে অবস্থিত।	সিন্ধুর লারকানা জেলার সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত। (বর্তমানে পাকিস্তানে)
আয়তন	১৫০ হেক্টর	২০০ হেক্টর
গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার	বিশ্বের প্রথম রুপোর ব্যবহারের প্রমাণ। দ্বিতীয় বৃহত্তম সিলমোহর আবিষ্কার। এবং নৌকা তৈরির কেন্দ্র।	পশুপতি-র সীলমোহর,বৃহত্তম সীলমোহর,স্নানাগার এবং ৭০০ কূপ পাওয়া গেছে। বিশ্বের প্রাচীনতম বস্ত্রের নিদর্শন মিলেছে মহেঞ্জোদাড়োতে।
বিশেষত্ব	হরপ্পা দেখতে প্রশাসনিক নগরের মতো এখানে ব্র্যাকেটে দূর্গীকরণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনে উত্তর এবং পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ এবং বেরোনোর জন্য দুটো দরজা ছিল হরপ্পার সব ঘর থেকে শৌচাগারের অবশেষ মিলেছে।	মহেঞ্জোদাড়ো দেখতে আধ্যাত্মিক নগরের মতো এটি হরপ্পা সভ্যতার সবথেকে প্রসিদ্ধ প্রত্নস্থল এই নগর কাঁচা ইঁটের দেয়াল দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

লেখক ইতিহাসের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: anirbanmanna288@gmail.com • M. 9836235875

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ রক্ষায় মৌমাছি

আলোকচিত্র : সৈকতকুমার বসু

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মৌমাছি ও মধু মানুষের কাছে বিশেষ সমাদৃত। আদিম মানবের উদ্ভবের প্রায় পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর পূর্বে মৌমাছির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাচীন মিশরীয় উপাখ্যান থেকে জানা যায়, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই সন্ধিপদী প্রাণীটি ছিল দক্ষিণ মিশরের প্রতীক। 'শু' নামক অন্ধকারের প্রেতাত্মা থেকে বাঁচার জন্য তারা মৌমাছির পূজো করত। বিষ্ণুর মাথার উপর বা পদ্মের উপর মৌমাছি থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন ভারতে মানব জীবনের সঙ্গে মৌমাছি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইফেসাসে অবস্থিত বিখ্যাত গ্রিক মন্দির আর্টিমিস। গ্রিক ইতিহাস থেকে জানা যায় এই মন্দিরে দেবতার পিছনের দেওয়ালে প্রচুর মৌমাছির ছবি আঁকা হত। গ্রিকরা মৌমাছিকে 'মেলিশি' বলে। তাই এই মন্দিরের পুরোহিতকে মেলিশি বলা হত। উৎসর্গীকৃত উপকরণ শুদ্ধ করার জন্য মধু ব্যবহারের প্রথা ছিল। প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায়, ব্যবিলনে মধু লাভের উদ্দেশ্যে মৌমাছি পালনের প্রচলন ছিল। বর্তমানেও মধু আমাদের সবারই পছন্দের খাবার। স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এই খাদ্যটি অনেকেরই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় গুরুত্বের সঙ্গে যোগ হয়েছে। মৌমাছি প্রকৃতি থেকে মধু সংগ্রহ করে তাদের বাসায় অর্থাৎ মৌচাকে সঞ্চয় করে, আমরা সেখান থেকে তা সংগ্রহ করি। মৌমাছিই হল একমাত্র পতঙ্গ যার দ্বারা উৎপাদিত খাদ্য মানুষ খেয়ে থাকে।

মৌমাছিরা মধু তৈরির শিল্পী। মানুষের তৈরি শিল্পে বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশ দূষিত হয়। মৌ-শিল্পে তেমনটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে এরা এই শিল্পকে চালিয়ে নিয়ে যায়। মধু সংগ্রহের জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে এই পরিবেশ-বান্ধব শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই মৌমাছির এত কদর।

পৃথিবীতে যদি মৌমাছি না থাকত তাহলে কী হতো? সহজ উত্তর আমরা মধু পেতাম না। শুধু কি তাই? বিশেষজ্ঞদের মতে মৌমাছি ছাড়া পৃথিবীতে হয়ত প্রাণের অস্তিত্ব টিঁকে থাকত না। কারণ এরা উদ্ভিদের পরাগমিলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানোর সময় মৌমাছিদের পা এবং বুকের লোমে অসংখ্য পরাগরেণু লেগে যায়। এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়লে পরাগমিলন ঘটে। উৎপন্ন হয় ফল। এইভাবে মৌমাছিরা গাছের অংশ বিস্তারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে এবং প্রাণীজগতে খাদ্য সরবরাহ করে। অধিকাংশ প্রাণীই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। পরাগমিলন না ঘটলে উদ্ভিদজগতই ধ্বংস হত। ফলে প্রাণের সঙ্কট দেখা দিত।

পৃথিবীর যে সকল দেশে পতঙ্গ-পরাগায়িত সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে সেখানেই মৌমাছি দেখতে পাওয়া যায়। বোলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এই পতঙ্গটি মধুমল্লিকা বা মধুকর নামেও পরিচিত। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'বী' (Bee)। বোলতারা মূলত পতঙ্গ শিকারী। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এক শ্রেণির বোলতা সেইসব পতঙ্গ শিকার করতে বেশি পছন্দ করত যারা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াত এবং পুষ্পরেণু দ্বারা আংশিক আচ্ছাদিত থাকত। শিকার ধরে এনে বোলতারা সেগুলোই তাদের লার্ভাদের খাওয়াত। সম্ভবত এর ফলেই বিবর্তনের পথ ধরে এরা এক সময় পতঙ্গ শিকারের পরিবর্তে পুষ্পরেণু সংগ্রহে আকৃষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে বোলতা থেকে মৌমাছিতে পরিবর্তিত হয়। বিশেষজ্ঞদের এমন ধারণা হওয়ার কারণ ক্রেটাসিয়াস যুগের একটি করবিকুলেট বি (corbiculate bee) মৌমাছির ফসিল।

পৃথিবীতে প্রায় কুড়ি হাজার প্রজাতির মৌমাছি আছে। এদের মধ্যে ভালো মধু সংগ্রাহক হল রক বী বা পাথুরে মৌমাছিরা (বৈজ্ঞানিক নাম—এপিস ডার্সাটা)। এদের এক-একটা মৌচাক থেকে গড়ে ৫০-৮০ কিলোগ্রামের মতো মধু পাওয়া যায়। ইউরোপিয়ান বী অর্থাৎ ইউরোপীয় মৌমাছিদের (বৈজ্ঞানিক নাম—এপিস মেলিফ্লেরা) প্রতি

মৌচাক থেকে গড়ে ২৫-৪০ কিলোগ্রামের মতো মধু পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান বী বা ভারতীয় মৌমাছিদের (বৈজ্ঞানিক নাম—এপিস সেরানা ইন্ডিকা) এক-একটি চাক থেকে গড়ে ৬-৮ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়। কেরলে এক ধরনের (প্রজাতির) মৌমাছি আছে যাদের হুল পূর্ণ বিকশিত হয় না। এরা 'হুলবিহীন মৌমাছি' নামে পরিচিত। এরা খুব ভালো পরাগসংযোজক হওয়া সত্ত্বেও এদের এক-একটা মৌচাক থেকে ৩০০-৪০০ গ্রামের বেশি মধু পাওয়া যায় না।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মৌমাছির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়িয়ে মৌমাছিযে পরাগমিলনের কাজ করে তা না করলে গাছে ফুল ফুটবে না, ফল ধরবে না, নতুন গাছের জন্ম হবে না। ফলে বহু গাছ প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবে। মৌমাছির চাকে যে মধু সঞ্চিত হয় তার উপর নির্ভর করে বহু মানুষের জীবিকা। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনীতিতেও মধুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গভীর জঙ্গলে পরাগমিলনের মধ্য দিয়ে মৌমাছিরা বন সৃজনের কাজও করে থাকে। প্রকৃতিতে এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের বংশ বিস্তারে অন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অনেক উদ্ভিদের ফুলের পরাগমিলন ঘটে বাত্যা তাড়িত হয়ে। এদের বাদ দিলে বাকি উদ্ভিদ এবং পরাগমিলনে অর্থাৎ বংশ বিস্তারে অন্য কোনো প্রাণী বা কীটপতঙ্গের উপর নির্ভরশীল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে মধু উৎপাদনকারী মৌমাছি। মৌমাছি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে এই উদ্ভিদজগৎও হারিয়ে যাবে। সংকটে পড়বে প্রাণীজগৎ। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে।

মৌমাছিকে আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি। এর প্রধান কারণ এদের হুলের বিষ। এই বিষ যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক এটি অ্যান্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন। এর মধ্যে রয়েছে রোগ নিরাময়ের উপাদান (ফর্মিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক ও অর্থোফসফরিক অ্যাসিড, হিস্টামিন, ট্রিপটোনেন, সালফার এবং ওজন হিসেবে ০-৪% ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট। বাতের চিকিৎসায় মৌমাছিল হুল ফোটোনো কোনো নতুন কথা নয়। গবেষকদের দাবী চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, উচ্চরক্তচাপ, গেঁটে বাতজনিত ব্যথা ইত্যাদির চিকিৎসায় মৌমাছির বিষ ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়াও মধু বহু রোগের মহৌষধ—একথা আমরা জানতে পারি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে। বৈদিক সাহিত্যে মধু ও দুধকে একত্রে অমৃত বলা হত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা আছে নিয়মিত অমৃত সেবনে অরুচি, হৃদরোগ, রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।

প্রাচীনকালে সংরক্ষণের কাজে যে মধু ব্যবহার করা হত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বাদশ শতকে গিজেহ নামক এক মিশরীয় পিরামিডে এক শিশুর শবদেহ পর্যবেক্ষণ করে আরব চিকিৎসক আবদ-আল-লতিফ যে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে সে সময় শবদেহ সংরক্ষণে মধু ব্যবহৃত হত। মিশরে মমি সংরক্ষণের জন্য মধু মাখানো হত। প্রাচীন তথ্যাবলী থেকে জানা যায়, আলেকজান্ডারের মৃতদেহ মধুর দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্রাচীন বাইবেলেও শবসংরক্ষণে মধুর ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। গৌড় রাজাদের আমলে আম সংরক্ষণের জন্য মধু ব্যবহার করা হত। শোনা যায়, মুর্শিদাবাদের নবাবকে অসময়ে আম খাওয়ানোর জন্য মধুতে আম ডুবিয়ে রাখা হত।

সৌন্দর্য বজায় রাখতে মধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্নানের জলে ২০০-২৫০ গ্রাম মধু মিশিয়ে স্নান করলে মুখের ও দেহের চামড়া মসৃণ থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপকার হয়।

মৌমাছি আমাদের নানাভাবে উপকার করে। পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরকম একটি পতঙ্গকে রক্ষা করতে আমরা কতটা যত্নবান? প্রকৃতিতে মৌমাছির নানা শত্রু আছে। এদের আক্রমণে মাঝেমাঝেই মৌমাছি কলোনী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এইসব শত্রুদের মধ্যে মোমপোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এরা কুঠুরির উপরে মাকড়সার জালের মতো আবরণ তৈরি করে। ফলে পিউপার মৃত্যু ঘটে। পূর্ণবয়স্ক মৌমাছিদের মধ্যে অ্যাকরাইন নামে এক ধরনের রোগ হতে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত মৌমাছিদের ডানাগুলি বিভক্ত হয়ে ইংরেজি 'জে' (J) অক্ষরের মতো হয়ে যায়। তখন এরা উড়তে পারে না। এতো গেল প্রাকৃতিক শত্রু ও রোগের কথা। আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ কি মৌমাছিদের বিপন্ন করে তুলছে না? বিশেষজ্ঞদের অনুমান কৃষিকাজে আমরা যেভাবে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহার করছি তাতে মৌমাছিদের আচার-ব্যবহার, দিকনির্ণয়ের ক্ষমতা, মধুসংগ্রহ নয় কিছুপ্রভাবিত হতে পারে। শারীরিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে যা ভবিষ্যতে বংশলোপের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নিজেদের স্বার্থেই মৌমাছিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই কীটনাশক ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। কাছাকাছি ফুল গাছ থাকলে এবং সে গাছে যদি ফুল ফুটে থাকে তাহলে সেখানে কীটনাশক স্প্রে করা উচিত নয়। না হলে, শুধু যে মৌমাছির জীবন সংশয় হতে পারে তা নয়, মধুতেও কীটনাশকের রেশ পাওয়া যেতে পারে যা আমাদের জীবনেও বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি—শাশ্বতী বিশ্বাস, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিসেম্বর ২০০২
2. পরিবেশ বান্ধব মৌ-শিল্প—প্রীতি বসু, সবুজ পৃথিবী, এপ্রিল-মে ২০১৭
3. https//en.wikipedia.org/wiki/Bee
4. https//pestworidforkids.org/pest-guide/bees
5. https//www.theguardian.com/environment/bees
6. https//bn.wikipedia.org/wiki

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

ডাঃ প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ (আলোলেখা)

হাতের লেখায় মনের হদিশ

হ্যাঁ ঠিক তাই। হাতের লেখা অর্থাৎ হস্তাক্ষরের গঠন, আকার প্রকার বিস্তার প্রভৃতি মাপজোঁক করে দেখে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত প্রকৃতি বিশ্লেষণের এক বিশেষ ধারা এটি। একে বলা হয় Graphology (Graph অর্থাৎ লেখচিত্র বা নকশা আর Logy অর্থে ল্যাটিন শব্দ logos যার মানে বিশেষভাবে চর্চা।)

এই বিশেষ ধারাটি বহু প্রাচীন। এরিস্টটল একবার বলেছিলেন— 'ব্যক্ত ভাষারা আসলে মনজগতের অভিজ্ঞতার সাংকেতিক প্রকাশ আর লিখিত শব্দরা ওইসকল ভাষায় ব্যক্ত শব্দসমূহের সাংকেতিক প্রকাশ। যেভাবে সকল মানুষেরই ব্যক্ত ভাষার ভিন্ন ভিন্ন হয় তেমনই সকল মানুষের হাতের লেখাও বৈচিত্র্যময় হতে বাধ্য!' ক্যামিলো বাল্ডি যিনি একজন ইতালিয়ান চিকিৎসক ছিলেন, ১৬২২ সালে তাঁর লিখিত একখানা বই ছিলো, নাম— 'How to judge The Nature and the character of a person from his letter'। প্যারিসের অ্যাব্বি মিকন গ্রাফোলজি শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন এই হাতের লেখা বিষয়টির চর্চার ক্ষেত্র বোঝাতে।

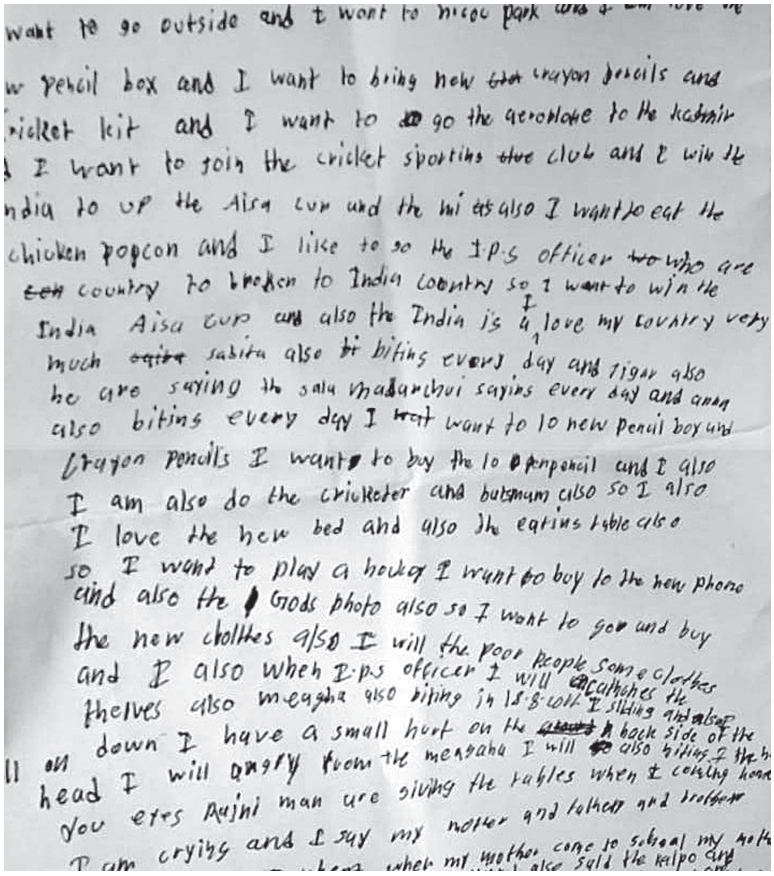
want to go outside and I want to
w pencil box and I want to bring new crayon pencils and
cricket kit and I want to go the aeroplane to the kashmir
I want to join the cricket sportins club and I win the
ndia to up the Aisa cup and the wi ets also I want to eat the
chicken popcon and I like to so the I.P.S officer who are
country to freedom to India country so I want to win the
India Aisa cup and also the India is I love my country very
much sabita also bitins every day and rigar also
he are saying the sala mashurchui sayins every day and anna
also bitins every day I want to 10 new pencil box and
Crayon pencils I want to buy the 10 pen pencil and I also
I am also do the cricketer and batsmum also so I also
I love the new bed and also the eatins table also
so I want to play a hockey I want to buy 10 the new phone
and also the Gods photo also so I want to go and buy
the new clothes also I will the poor people some clothes
and I also when I.P.S officer I will clothes the
shelves also meagha also bitins in 15.8.2011 I sliding and also
down I have a small hurt on the back side of the
head I will angry from the meagha I will also bitins I the h
you eyes Rajni man are sivins the tables when I coming home
I am crying and I say my mother and father and brother
when my mother come to school my moth
also said the kalpo cut

হাতের লেখার গঠন আকার, প্রকার, বিস্তার কিভাবে যে আসলে এই মনের হদিশ দিতে সক্ষম, তা জানতে হলে শারীরবৃত্তীয় কার্যকারিতার ব্যাপারে একটু অবশ্যই বলতে হবে এখানে।

স্থূল চোখে দেখলে আমরা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে (কলম বা পেনসিল বা চকখড়ি ব্যবহার করে) লিখি। কিন্তু কেবল হাত বা আঙুল কি এককভাবে লিখতে সক্ষম? না। মস্তিষ্কের সুচারু নির্দেশনা ভিন্ন এই সূক্ষ্ম কার্যটি সম্পাদন করা অসম্ভব।

বহু বিবর্তনকে জয় করে আসা সর্বোন্নত জীব মানুষের মস্তিষ্কের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ তিনটি অংশ— গুরুমস্তিষ্ক লঘুমস্তিষ্ক আর মেরুরজ্জু। সংক্ষেপে বলতে গেলে এদের কাজ নিম্নরূপ : গুরুমস্তিষ্ক চিন্তা করতে, বুদ্ধি দিয়ে কার্য সম্পাদন করতে, স্মৃতিধারণ ও স্মৃতিচারণ প্রভৃতি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে লঘুমস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এছাড়াও মনোযোগ দিতে, এবং ভয়, উত্তেজনা, আনন্দের অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

মেরুরজ্জু মৌলিক জৈবিক কার্যাবলী যেমন শ্বাসপ্রক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের প্রক্রিয়া ও স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। গুরুমস্তিষ্কের এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারার বিষয়টিই নিম্নস্তরীয় প্রাণীদের থেকে মানুষকে উন্নততম পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে (হাঁটা একরকম স্বনিয়ন্ত্রিত ঐচ্ছিক বা Voluntary action) হঠাৎই আপনি পেটের নাভির কাছে একটা তীব্র খামচে ধরা ব্যথা অনুভব করলেন (এই ব্যথার অনুভূতিকে অনুভবের বিষয়টাকে অনৈচ্ছিক বা Involuntary action বলা যায়)। ফলত মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় হাঁটার গতি হ্রাস করে থামতে বা বসে পড়তে আপনি বাধ্য হবেন। অর্থাৎ শরীরের Involuntary (অনৈচ্ছিক) ক্রিয়াকলাপ (যেমন শ্বাসের গতি বা হার্টরেট) Voluntary

এবার চলুন, একটু দেখা যাক হাতের লেখায় মনের হদিশ পাওয়া কিভাবে সম্ভব?

(ঐচ্ছিক) ক্রিয়াকলাপকে (যেমন হাঁটা চলা কথা বলা) দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এরা পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

হাত দিয়ে লেখা একরকম Voluntary বা ঐচ্ছিক কার্য। যেমনভাবে আমরা ঐচ্ছিক পেশী ব্যবহার করে হাঁটি, কথা বলি, হাত পা মুখ নাড়ি ঠিক তেমনি।

আবার ধরুন মর্নিংওয়াকের সময় রাস্তায় যেতে যেতে রোজ প্রথম মোড়ের সামনে একটা আবর্জনার স্তূপের ভ্যাট পেরিয়ে আসতে হয় আপনাকে। এখানটা পেরোনোর আগে থেকেই প্রতিদিন আপনি সন্তর্পণে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকটা চাপা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেন আর উল্টোপাশে তাকাতে তাকাতে সে জায়গাটা দ্রুতগতিতে পেরিয়ে যান— এমনকি সেই জায়গা আবর্জনা শূণ্য হলেও। আবার এরপরই ঠিক দ্বিতীয় মোড়টা পেরোনোর ছ'পা আগেই বাঁ পাশের মিষ্টির দোকানে দেখেন গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। এখানটা এলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় যেমন আপ্লুত হয় তেমনি পায়ের গতিও হ্রাস হয়! অর্থাৎ এই যে দুরকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর তাতে শরীরের বাহ্যিক কার্যকারিতা ও প্রকাশ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে এসব তো মস্তিষ্কের নির্দেশেই। হাতের লেখাও তেমনই মস্তিষ্কের নির্দেশে ঘটা হাতের পেশী, কাঁধ-কনুই-কব্জির-আঙুলের সন্ধির এক যৌথ ও সঙ্গবদ্ধ জটিল প্রক্রিয়া।

কি কি দেখে এই ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করা হয়—

Gestalt আর Trait দুরকম পদ্ধতিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

কাগজের ওপর হাতের লেখার প্রাথমিক পরিচ্ছন্নতা, কাগজের ওপর ব্যবহৃত কলমের কতখানি চাপ বা জোর (Pressure) প্রয়োগ হলো, লেখার শব্দ অক্ষরগুলো কাগজে কতখানি জায়গা দখল করে অবস্থান করছে (Size of writing), কাগজের ওপর লেখার সাহায্যে যে কাল্পনিক মার্জিন তৈরি হয়, তার গঠনপ্রকৃতি, লেখার Zone বিভাজনের প্রকৃতি, লেখার অবস্থানগতভাবে ঝুঁকে থাকা (Slant), যুক্ত হবার ভঙ্গি (Connecting strokes), প্রতিটি অক্ষরের একক ও সংযুক্ত গঠন প্রকৃতির ভিন্নতা ইত্যাদি। আসলে এত বিস্তারিত ও গভীর এই বিষয় যে এত সংক্ষেপে সবটা বলে ওঠার অবকাশই নেই। এটি প্রথম উপায়। অন্যটিতে প্রতিটি অক্ষরের প্রতিটি রেখার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিকৃতি বা বিচ্যুতি প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রাফোএনালিসিস করা হয়।

কি কি ধারণা পাওয়া যায় হাতের লেখার গ্রাফোলজিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে?

একজন ব্যক্তির ভাবনা চিন্তার ধরন, আবেগ-অনুভূতি, রাগ প্রবণতা, রোগ প্রবণতা, অতীত রোগের ইতিহাস, মানসিকতার ধরন, মানসিকভাবে ধ্বংসাত্মক নাকি গঠনমূলক, পারিবারিক বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেমন, নেতৃত্ব ক্ষমতা বা অনুগত হবার প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব।

যেমন ছোট্ট উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যারা কাগজের ওপর কলমের অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে (পরের দু তিনপৃষ্ঠাতেও ছাপ উঠে যায়) লেখেন তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট ভালো হলেও এরা ভীষণ তীব্রভাবে ক্রোধের প্রকাশ করে থাকেন এবং সহজে অতীতের অপ্রিয় ঘটনা ভুলে যান না এবং এদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যার প্রকোপ দেখার মাত্রা অনেক বেশি (সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ও বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হয়)।

বর্তমানে প্রশিক্ষিত গ্রাফোলজিস্টরা গ্রাফোথেরাপি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করছেন। এর প্রয়োগ দ্বারা বাচ্চাদের অতিরিক্ত দুরন্তপনা কমিয়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলা, বা বড়দের মানসিক চাপ অত্যধিক উত্তেজনা প্রবণতা কমানো, মানসিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও তার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা বা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো বিশেষ আকর্ষণের দিক নিঃসন্দেহে।

যাইহোক আমরা আমাদের চোখ কান আর মন খোলা রাখতে পারলে এমন মনোগ্রাহী এবং ভীষণ প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই জানতে পারবো। আর নিজেদের জীবনে তা কাজে লাগাতে পারবো।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গ্রাফোলজিস্ট ও লেখিকা রুথ গার্ডনার, গ্রাফোলজিস্ট জুবিন ভাবেইনা, অখিলেশ ভাগবত, ইন্দরজিত চাওলা প্রমুখ গ্রাফোলজির সকল পথপ্রদর্শক এবং সর্বোপরি শিক্ষক শ্রী অমিত সেন, শিক্ষানিকেতন)

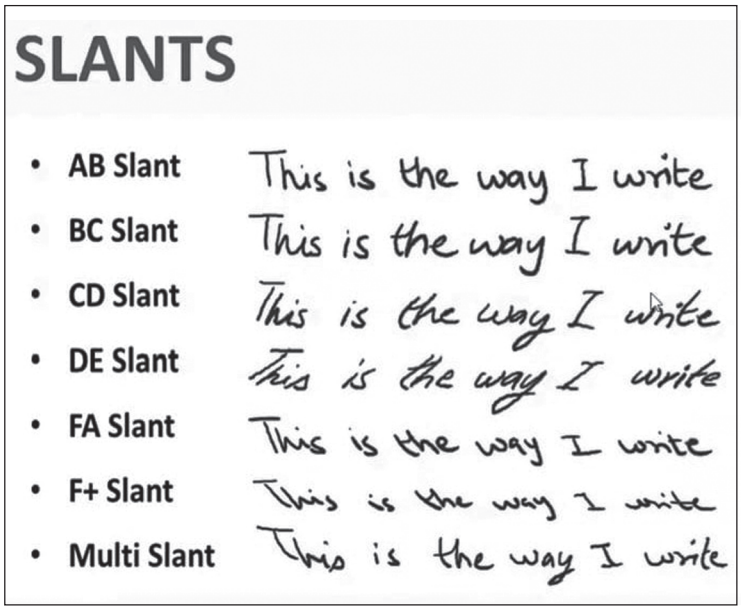

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: debnathyehoo@gmail.com • M. 9831783659

■ *সায়েন্স কুইজের উত্তর*

১. ভিটামিন ডি ২. সিংহ ৩. আইসোবিউটেন ৪. গতিজাড্য ৫. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ৬.৭.৪-৭.৬ ৭. AB^+ ৮. ৭২ বার প্রতি মিনিটে ৯. জিব্বারেলিন ১০ ক্যারাটিন।

মৃদুল শ্রীমানী

অটো ভন গেরিক ও বাতাসের চাপ এবং করিয়োলিস সাহেব

১

ঝড় তুফান টাইফুন সাইক্লোন টর্ণেডো, যাই বলুন না কেন, সেটি আদত বিচারে বাতাসের চাপের হেরফের।

বাতাসের চাপ জিনিসটা যে কী সাংঘাতিক সেটা আমার ছোটবেলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী অটো ভন গেরিক। সেই ম্যাগডেবার্গ শহরের মহানাগরিক ছিলেন তিনি। অতীতের গুণীরা বলতেন nature abhors a vacuum. কিন্তু গেরিক তাঁর 'একসপেরিমেন্টা নোভা' বইতে বাতাসের শূন্যতা নিয়ে আলোচনা করলেন। ১৬৫৪ সালে তিনি বই লিখেছেন ভ্যাকুয়াম পাম্প নিয়ে, আর ১৬৫৭ সালে কুড়ি ইঞ্চি ব্যাসের দুটি অর্ধগোলক গায়ে গায়ে এঁটে তার ভিতরের হাওয়া টেনে বের করে দিয়ে বাতাসের চাপ যে সর্বতোমুখী, সেটা প্রমাণ করে দিলেন। ওই গোলকের দুই দিকে আংটায় আটখানা করে তাজা ঘোড়া লাগিয়ে তারপর টান দিয়ে তবে খোলা গেল। ২১ মে অটো ভন গেরিকের প্রয়াণ দিবস। ১৬৮৬ তে প্রয়াত হন। জন্মেছিলেন ৩০ নভেম্বর ১৬০২ সালে।

বাতাসের চাপ নিয়ে বেশ ভাবিয়ে তুললেন অটো ভন গেরিক। অনেক পরে বদ্ধ কাচনলের ভিতর বাতাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে থাকে। ক্রুকস নল, কুলিজ নল তার উদাহরণ। বদ্ধ কাচনলে বাতাসের চাপ কমিয়ে দিতে দিতে ক্যাথোড রশ্মি বেরিয়ে এল। ওইপথে খোঁজ পাওয়া গেছে ইলেকট্রনের। সেই কৃতিত্ব জেমস জোসেফ টমসনের। আর ওই রাস্তায় হেঁটে উইলহেল্ম রন্টজেন দেখিয়েছেন এক্স রশ্মি।

ওই কাচনল আর অজানা রশ্মির কথা ভাবতে ভাবতেই হেনরি বেকারেল ইউরেনিয়ামের লবণযৌগ থেকে আবিষ্কার করেন তেজস্ক্রিয়তা।

২

বাতাস নিয়ে ভাবি। আর শরৎ সাহিত্যের শ্রীকান্ত হয়ে ভাবি ঝড়ের কথা। কাপ্তান কইছে ছাইক্লোন হতি পারে। এই যে এতবড় পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবে পাক খাচ্ছে, তাতে হাওয়ার উপর একটা প্রভাব পড়ে। সে কথাটা আমার ছোটবেলায় কানে কানে বলে গিয়েছেন উইলিয়াম ফেরেল (২৯.০১.১৮১৭-১৮.০৯.১৮৯১)। মৌসুমি নামে বোন ছিল বড়জেঠুর ঘরে। তাকে বহুদিন আগে হারিয়েছি। মৌসুমি বাতাস হয়ে সে মাঝে মাঝে টান দিয়ে যেত আমার চেতনার গোড়ায়। ফেরেল সাহেব শিখিয়েছেন তার চলনপথের কায়দা কানুন। আমেরিকার এই গণিত বিশারদ আইডিয়াটা পেয়েছিলেন এক ফরাসি বিজ্ঞানীর কাছে। তিনি গুস্তাভ গ্যাসপার্ড করিয়োলিস। তিনি ঘুরন্ত যন্ত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে ১৮২৯ সালে বই লিখেছেন 'ক্যালকুল দে লা এফেট দেস মেশিনস'। তিনি বলেছিলেন বেশ বড় কোনো একটা জিনিস ঘুরলে তার চারপাশে সে একটা ঝাঁকি দেয়। ওই থেকে বোঝা গেল, পৃথিবীর ওপরে চলন্ত জিনিস উত্তর গোলার্ধে চলনপথের একটু ডানদিকে ছিটকে যাবে, আর দক্ষিণ গোলার্ধে তেমন চলন্ত জিনিস বামপন্থী হতে চাইবে। এই নিয়ে কথা বলেছেন ১৮৩৫ সালে। তিনি অবশ্য সুদূর কল্পনাতেও ভাবেন নি যে তাঁর ধারণাটা ফেরেল সাহেব বাতাসের ক্ষেত্রে খাটিয়ে দেবেন। ঝড়ের কথাও এই সূত্রে আসে। ২১ মে হল করিয়োলিস সাহেবের জন্মদিন। ১৭৯২ সালে জন্মেছেন। একান্ন বৎসর বয়সে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩ সালে তিনি প্রয়াত হন।

৩

তুফানী চুমুক জানার অনেক আগেই নজরুল ইসলামের সাথে একই কণ্ঠে বলেছি 'মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল'। তারও আগে থেকে আমি বিবেকানন্দ স্বামীকে জানতাম তুফানী সাধু হিসেবে। অমন ডাইনামিক সাধু আর দেখলাম না। সন্ন্যাস নিয়েছেন তো কী? গর্ভধারিণী মা আর অন্যান্য আত্মীয়াকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন তিনি। আইরিশ যুবতীকে নিয়ে গিয়েছেন আলমোড়া। ব্রহ্মচর্য টসকায় নি। ঝড়ের পাখি ভাবতাম ডিরোজিও সাহেবকে। ঝড়ের কাছেই আমার ঠিকানা ছিল।

ঝড় আসছে কি না, কতক্ষণে আসবে, কতদূরে রয়েছে, এইসব বলার জন্য আবহবিজ্ঞানীরা ব্যারোমিটার যন্ত্র কাজে লাগান। বাতাসের চাপ মেপে ঝড়ের মেজাজ মর্জি গতিপ্রকৃতি জানার প্রাথমিক চেষ্টা করেন তাঁরা।

গ্যালিলিও পারেন নি। অতো বড়ো বিজ্ঞানসাধক ভাবতেই পারতেন না বাতাসের ভর থাকলেও সামগ্রিক আবহমণ্ডলের একটা চাপ দেবার ক্ষমতা আছে। সেটা তিনি আদৌ বিশ্বাসই করতেন না। জমিদার বাড়ির বাগানে গাছপালায় জল দিতে হবে। পাম্প করে জল

টেনে তুলতে হবে। জল কি উঠবে? দেখা গেল, জল চৌত্রিশ ফুটের বেশি তোলা যাচ্ছে না। কারণটা ভাবতে বসলেন গ্যালিলিও সাহেবের ইতালীয় ছাত্র ইভানজেলিস্তা টরিসেলি (১৫.১০.১৬০৮ - ২৫.১০.১৬৪৭)। ভরতি করে পারদ ঢেলে নিলেন একমুখ সিল করা, একমুখ খোলা একটা এক মিটার লম্বা নলে। এবার নলের খোলা মুখে আঙুল চেপে পারদ ভরতি পাত্রে খোলা মুখটা ডুবিয়ে আঙুল সরিয়ে নিলেন। নলের পারদ কিছুটা নেমে এল। ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার বা ত্রিশ ইঞ্চি উচ্চতায় থেমে রইল পারদস্তম্ভ। বারবার প্রতিবার ওই একই উচ্চতায় থামে পারদস্তম্ভ। ১৬৪৩ সালে এইসব করলেন। তৈরি হল ব্যারোমিটার। বললেন আবহমণ্ডলের চাপে জল ওঠে চৌত্রিশ ফুট অবধি। আর পারদ ওঠে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার অবধি। ১৬৪৪ সালে এইসব ভাবনা নিয়ে বই লিখলেন 'অপেরা জিওমেট্রিকা'। দার্শনিক রেনে দেকার্তে এ নিয়ে ভেবেছিলেন আগেই, ১৬৩১ সালে। ভাবনা মাত্র হাতে কলমে করে সেই সব বিবরণ আর ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করে দেখালেন টরিসেলি। এরপরে ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাস্কাল (১৯.০৬.১৯২৩-১৯.০৮.১৬৬২) ব্যারোমিটার যন্ত্রের আরো উন্নতি করেন। সমুদ্র সমতলে বাতাস প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কতটা চাপ দেয় সেটা আজ মানুষ জানে। ওকে বলে এক এটিএম। টর এবং পাস্কাল নামেও বাতাসের চাপের একক আছে। ওইসব নামে টরিসেলি ও পাস্কালকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন আবহবিজ্ঞান।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

• *M. 9831949581*

চিঠিপত্র

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা বিষয় বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সুমুদ্রিত সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করেন। ব্যাক কভার পেজের তথ্য সমৃদ্ধ ব্যবহার অভিনব। সাম্প্রতিক ক্যানসার সংখ্যায় প্রকাশিত সৌম্য কান্তি জানার মেরুন ওরিওল দেখার অভিজ্ঞতা বা অনিন্দ্য দে র ডিজিট্যাল থার্মোমিটারের কাহিনী ভালো লাগলো। কমলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ক্যানসার এর প্রাথমিক পরিচিতি খুব সহজ ভাষায় বোঝানো হলেও অজয় মজুমদারের লেখা গুলি তে সহজ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যার বদলে স্বল্প পরিসরে এত বেশি ইংরেজি টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে, কিছু নতুন তথ্য জানা গেলেও অনেক কিছু ধোঁয়াশা থেকে গেল।

অভীক পট্টনায়ক
বালিঘাই, পূর্ব মেদিনীপুর
৭২১৪২২

সংবাদ

১৪ মে ২০২৩ উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে 'প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মজবুত লড়াই চাই' বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকার বিশেষ পাখি সংখ্যার প্রকাশ। 'বিজ্ঞান দরবার' (কাঁচরাপাড়া) এবং 'গোবরডাঙা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি'-র আয়োজনে এই সভা বসেছিল। আহ্বায়ক ছিলেন জয়দেব দে ও দীপককুমার দাঁ। এদের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় পাখিচর্চা (সংকলন) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যাঁর লেখক ড. কণাৎ বৈদ্য ও দীপককুমার দাঁ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। দীপককুমার দাঁ রচিত 'মিষ্টি জলের সংকট ও প্রতিকার' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন স্বদেশ মিশ্র ও অনুপম পাল। এই অনুষ্ঠনে বহু বিশিষ্ট বক্তারা বক্তব্য রাখেন। বই ও পত্রপত্রিকার আয়োজন করা হয়েছিল।

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

২ নং ডেকার্স লেন, রবি সাহা, কলকাতা-৬৯ M. 8961066724 • স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231 • তাপস কুমার প্রামাণিক, নোভা, কলকাতা M. 9836133980 • দিলীপ দাস, বিজ্ঞান ভাবনা, বহরমপুর M. 8926454316

প্র বী র ব সু

বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু এবং প্রকৃতি প্রেমিক সম্রাট জাহাঙ্গীর

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা আমরা প্রায় সকলেই পড়েছি। ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত। বিভিন্ন শিল্পকলার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ এবং অনুরাগ। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। প্রখ্যাত পক্ষীবিদ ড. সেলিম আলি প্রকৃতি বিজ্ঞানী জাহাঙ্গীরের ওপর একটি বিশেষ রচনায় উল্লেখ করেছিলেন, জাহাঙ্গীর যদি ভারত সম্রাট না হয়ে কোনও প্রকৃতি বা ঐতিহাসিক যাদুঘরের প্রধান হতেন, তাহলে অনেক বেশি সুখী মানুষ হতেন। জাহাঙ্গীরের বিভিন্ন বিজ্ঞান নির্ভর বর্ণনা এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীটি সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রকৃতি বিজ্ঞানের এক জীবন্ত দলিল। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

জাহাঙ্গীরের নিজস্ব সংগ্রহে ছিল বিভিন্ন রকম মাংসাসী প্রাণী, শিকারি পাখি এবং গৃহপালিত বিভিন্ন প্রজাতি। তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি স্বল্প পরিসরে খুব বাছাই করা কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দুর্লভ প্রজাতিগুলিই তাঁকে বেশিমাত্রায় আকৃষ্ট করেছে। তিনি বিভিন্ন দুর্লভ প্রাণী ও উদ্ভিদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। তিনি ভারত সাম্রাজ্যের ব্যস্ত সম্রাট হয়েও প্রকৃতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিখুঁত পারদর্শিতার সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে নিরীক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর উপলব্ধ জ্ঞানকে যথাসম্ভব যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং পাখি ও উদ্ভিদের ছবি তার সময়ের সেরা চিত্রশিল্পী উস্তাদ মনসুরকে দিয়ে আঁকিয়েছেন। উস্তাদ মনসুরের অঙ্কিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি এতটাই জীবন্ত যে সেগুলি আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ব্যবহারের উপযোগী। সে সমস্ত চিত্রকলা পৃথিবীর বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি এবং যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

জাহাঙ্গীরের সময় প্রাণী বিজ্ঞানের অনেক কিছুই অজানা ছিল। তখন প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের ধারণা স্বচ্ছ ছিল না। তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব রীতিতে প্রাণীদের শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন। প্রাণীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে এক একটা ভাগ করেছিলেন। যেমন পাখির ঠোঁট, পালক, রঙ, আয়তন প্রভৃতির দিকে নজর দিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা নতুন মোড় নেয় পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে। এইরকম এই সন্ধিক্ষণেই আমরা পেয়েছিলাম প্রকৃতিপ্রেমিক এবং বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু সম্রাট জাহাঙ্গীরকে।

যে সব প্রাণীর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ সম্রাট জাহাঙ্গীর লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজসরল ভঙ্গিতে তার মধ্যে আমরা পাই বুনো ছাগল, ভেড়া, এন্টিলোপ, চমরী গাই, জেব্রা, দেবনাক, হাতি, চিতা বাঘ, টার্কি। এছাড়াও মাকড়সা এবং বিভিন্ন পাখি। বিশেষত সারসের ডিমপাড়া, ডিম ফোটানো এবং বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার ওপর তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর বর্ণনা। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর লিপিবদ্ধ করা প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বুনো ছাগলের উল্লেখ করেছেন। জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন এই বুনো ছাগল পাওয়া যেত আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণ কাশ্মীর, পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা, ঝিলাম নদীর উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল প্রভৃতি জায়গায়, সিন্ধুনদের পশ্চিম পাহাড়ে লাদাখ, সুলেমান পর্বত প্রভৃতি অঞ্চলে। আফগানরা একটি বন্য ছাগল শিকার করে এনেছেন যার সম্পর্কে আমি কখনও ভাবিনি। আমি আমার চিত্রশিল্পীকে একটা ছবি আঁকতে নির্দেশ দিয়েছি। এদের শিং-এর দৈর্ঘ্য মাপলাম—দেড় গজ লম্বা এবং ওজন ৫৫.৩৮ পাউন্ড। তিনি ওই বন্য পুরুষ ছাগলের জন্য সাতটি বারবারী স্ত্রী ছাগলের প্রজননে ছয় মাস পর ৪টি স্ত্রী, ৩টি পুরুষ ছাগলের জন্ম হয়। যাদের দেখতে খুব সুন্দর ছিল। এছাড়া তিনি এক ধরনের পার্শিয়ান বুনো ছাগলের কথা লিখেছেন। এটিও পাওয়া যায় বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, পশ্চিম সিন্ধু প্রভৃতি জায়গায়। এর মাংস খুবই সুস্বাদু, এর ওজন ১২৪.৬ পাউন্ড।

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন আর একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী অ্যান্টিলোপ প্রসঙ্গে। তিনি উল্লেখ করেছেন মালওরা প্রদেশে কাসিমঘেরা গ্রামের রাস্তায় একটি সাদা জন্তু মারা হয়েছিল। এর ছিল চারটি শিং, তার মধ্যে দুটি ছিল একেবারে চোখের প্রান্তে এবং লম্বায় দুই আঙ্গুল। বাকি দুটি শিং চার আঙ্গুল লম্বা এবং ঘাড়ের দিকে অবস্থিত। ভারতের লোকেরা একে বলে দুধারিয়া। স্ত্রী এন্টিলোপের কোনো শিং নেই। কিন্তু পুরুষের চারটি শিং।

এরপর চমরীগাই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, তিব্বতের প্রধান জমিদারের পাঠানো উপহারের মধ্যে আমি দুটি চমরীগাই দেখলাম। এদের মুখ অনেকটা মোষের মতো। এদের গা ঘন বড় বড় লোমে ঢাকা, অনেকটা ঠান্ডা অঞ্চলের প্রাণীদের মতো।

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহনের ষোড়শবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক উপহার পেয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল একটি জেব্রা। সম্রাট এর আগে কখনও জেব্রা দেখেননি। তিনি এটিকে প্রথমে বুনো গাধা ভেবেছিলেন। তিনি এটির বর্ণনায় লিখেছেন, "আমি একটি অদ্ভুত দর্শন বুনো গাধা দেখলাম যা ঠিক হলুদ-কালো

ডোরাকাটা। চোখের চারপাশে সুক্ষ্মভাবে কালো বলয় আঁকা। নাকের ডগা থেকে লেজের প্রান্ত পর্যন্ত কান থেকে মুখ অবধি পুরোটাই ডোরাকাটা। ঠিক যেন মনে হয় কোনো চিত্রকর তুলি দিয়ে এই প্রাণীটির দেহে চিত্রকর্ম করেছেন। পরে জানা গেল এটির চিত্রকর স্বয়ং প্রকৃতি। এটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি। সিংহল থেকে একজন এক অদ্ভুত জন্তু নিয়ে এল তার নাম দেবনাক। এর মুখটা ঠিক বাদুড়ের মতো, শরীরের আকৃতি হনুমানের মতো। এর খাবার হল ফলমূল আর দুধ। এর কোনো লেজ নেই। আমি এই অদ্ভুত জন্তুটির ছবি আঁকার নির্দেশ দিলাম।

এরপর তিনি লেঙ্গুর সম্পর্কে বলেছেন, "লেঙ্গুর হনুমান গোত্রের একটি প্রাণী। কিন্তু হনুমানের লোম হয় হলদেটে, মুখ হয় লাল, কিন্তু লেঙ্গুরের লোম হয় সাদা এবং মুখটা কালো। লেজটি হনুমানের লেজের দ্বিগুণ লম্বা।

পাখিদের সম্পর্কে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বিভিন্ন পাখির বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের প্রজনন, বাসস্থান, স্বভাব ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে লিখেছেন। একবার মুকাররব খান সম্রাটকে একটি বিদেশি পাখি উপহার দিয়েছিলেন। সেটির নাম হল টার্কি। এটিকে এদেশে এনেছিলেন পতুর্গীজরা। যাদের কাছ থেকে খান সাহেব এটা কিনেছিলেন। জাহাঙ্গীর লিখেছেন, "মুকাররব খানের আনা পাখিটি আগে কেউ কখনও দেখেনি। এর নামও কেউ জানে না। এটি আকারে মুরগীর থেকে বড় কিন্তু ময়ুরের থেকে ছোট। এর মাথা ঠোঁট এবং গলার নিচের অংশের রঙ প্রায়ই বদল হয়। কখনও লাল, কখনও সাদা। এদের মাথায় মোরগের মতো ঝুঁটি আছে। এদের চোখের চারপাশের রং কখনও বদল হয় না। এদের পালকে বিভিন্ন রং দেখা যায়।

সারস নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর অনেক পরীক্ষা করেছেন। তার লেখায় আজমীর ও সুরাটের মধ্যবর্তী দেওগাঁও-এ একটি উদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার প্রহরি দুটি বাচ্চা সারস ধরে এনেছিল। রাতে দুটি বড় সারস এসে উপস্থিত হল এবং উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। আমার মনে হয় প্রহরির ধরে আনা বাচ্চা সারস দুটি বোধহয় এদেরই শাবক, সেইজন্যই এরা কাঁদছে। আমি প্রহরিকে বললাম বাচ্চা দুটিকে এদের কাছে এনে দিতে। বাচ্চা দুটিকে আনা মাত্র বড় সারস দুটি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের মুখে খাবার দিতে লাগল। তারপর বাচ্চা দুটিকে নিয়ে তারা বাসায় ফিরে গেল। আমার আরও দুটি বড় সারস ছিল। তাদের নাম দিয়েছিলাম 'লায়লা' ও 'মজনু'। একদিন প্রহরি এসে বলল, সে ওই দুটি সারসকে জোড় বাঁধতে দেখেছে। আমি বললাম এর পরের বার এরকম ঘটলে যেন আমাকে ডাকে। ভোরবেলায় আমাকে ডাকল। আমি দৌড়ে গেলাম। পরের রবিবার ওই সারসরা কিছু খড় জোগাড় করল এবং স্ত্রীটি প্রথম ডিমটি পাড়ল। ঐ সারস দুটি যখন ধরা হয়েছিল তখন বয়স ছিল ১ মাস, আমার কাছে এরা রয়েছে ৫ বছর। সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে এরা জোড় বাঁধল এবং এক মাস ধরে বারবার এটা হল। স্ত্রী সারসটি সারারাত ধরে ডিমে তা দেয়, পুরুষ সারসটি পাহারা দেয়। একবার একটা বড় বেজি এসেছিল, তাকে পুরুষ সারসটি ভীষণভাবে তাড়া করল। সকাল হলে পুরুষটি গিয়ে স্ত্রীটিকে ঠোঁট দিয়ে খোঁচা মারে, তখন স্ত্রীটি উঠে এসে পাহারায় বসে, পুরুষটি ডিমে তা দিতে বসে। সারাদিন পালা করে তারা ডিমে তা দেয়, আর পাহারা দেয়। এর মধ্যে কয়েকদিন খুব বৃষ্টি হল। তখন তার দিনের বেলায় পালা বদল করল না, পাছে ডিমগুলির ঠান্ডা লেগে যায়। ৩৪ দিন পর প্রথম ডিম ফুটে বাচ্চা বের হল। প্রথমদিন বাচ্চাটি কিছু খেলো না। দ্বিতীয় দিন থেকে মা সারসটি ছোট ছোট পোকামাকড় এনে বাচ্চাদের খাওয়াতে লাগল। বাচ্চাদের প্রতি বাবা সারসটির ভালোবাসা ও স্নেহ কিছু কম ছিল না। সেও নানাভাবে বাচ্চাগুলিকে আদর করত।

একবার একটি স্ত্রী সারস মারা গিয়েছিল, পুরুষ সারসটি ওই মৃতদেহের সামনে দীর্ঘদিন বসেছিল। ওইভাবে সেও দেহত্যাগ করল। এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা সম্রাট পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন গাছ ও ফুল সম্পর্কেও তাঁর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। যেমন পদ্ম, শালুক, পলাশ, চাপা, স্থলপদ্ম, লজ্জাবতী, কলাগাছ। তিনি বিভিন্ন ফলের ওজন লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু,চেরী, পিচ প্রভৃতি।

বাগান তৈরির ব্যাপারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের খুব আগ্রহ ছিল। সুন্দরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অপরিসীম। তাঁর লেখায় অনেক সুন্দর সুন্দর বাগানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত ছিল কাবুল, আগ্রা, কায়বানা, আহমেদাবাদ, কাশ্মীর ও লাহোরে।

১৬১৫ সালে প্লেগ মহামারি রূপে দেখা দিয়েছিল। তার বর্ণনাও সম্রাটের লেখায় আমরা পাই। এই সময় এই রোগ সম্পর্কে কারোরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, "গত দুবছরের খরার ফলে রোগটি হচ্ছে। কেউ কেউ বললেন, বাতাসের কোনো দূষণের ফলেই রোগটি ছড়াচ্ছে।" আসফ খানের কন্যা বর্তমানে আবদুল্লা খানের স্ত্রী আমাকে বললেন, "আমার বাড়ির উঠোনে আমি একটি ইঁদুরকে ছটফট করতে দেখেছি।" আমি মেয়েটিকে বললাম, ইঁদুরটির লেজ ধরে তাকে বেড়ালের দিকে ছুঁড়ে দিতে। সে তাই করল। পরেরদিন বেড়ালটা মারা গেল। তার মুখের ভেতর ও জিভ সম্পূর্ণ কালো হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর যে মেয়েটা ইঁদুরটাকে ধরেছিল, তার শরীরে প্লেগ দেখা দিল এবং সে মারা গেল। একইভাবে বাড়ির সাত-আটজন মারা গেল। রোগটি খুব ছোঁয়াচে। এছাড়া একটি কুকুরের কামড়ে হাতির মৃত্যুও আমি দেখেছি।

সম্রাট জাহাঙ্গীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনাও পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতু, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আগ্রহ এবং তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণও লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের সত্যিই অবাক করে দেয়। প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই আগ্রহই তাঁকে সত্যি সত্যিই একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ও বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

M. 9830676330

ড. তপন দাস

ভাঁট ফুলের বন্ধুত্ব

ভাঁট ফুল, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সমগ্র পশ্চিম বাংলা জুড়েই এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও এরা পথের ধারে অনাদরেই বেড়ে উঠে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই এর দেখা মেলে কম বেশী। অঞ্চল ভেদে একে বনজুঁই, ভাটি ফুল বা ঘেঁটু এবং ঘণ্টাকর্ণ বলেও ডাকা হয়। পাঁচটি সাদা পাপড়ির মাঝে বেগুনি রঙ মাখানো এই ফুলের শোভা নজর এড়ায়নি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কবি জীবনানন্দ দাশের। কবি জীবননন্দ দাশ 'বাঙলার মুখ' কবিতায়, মৃত স্বামীর প্রান ভিক্ষায় দেব সভায় নৃত্যরত বেহুলার পায়ে পরিয়ে দিয়েছেন ভাঁট ফুলের নুপুর। ভাঁট ফুলের আরেক নাম ঘণ্টাকর্ণ। রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর 'সে' শিরোনামে লেখা গল্পটিতে পাওয়া যায় ঘণ্টাকর্ণকে। বিভূতি ভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালিতে' ভাঁট ফুলের উল্লেখ করেছেন। তিনি বসন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ঘেঁটুফুল দিয়ে। শুধু তাই নয় একটি পোড়ো ভিটাকে তিনি আলোয় আলোকিত করে তুলেছেন এই ঘেঁটু ফুলের ঝাড় দিয়ে। অর্থাৎ একথা বলাই যায় সাহিত্যে ভাঁট ফুলের কদর ছিল সবসমই। উত্তরের বেশ কয়েকটি লোক সংস্কৃতিতেও এই ফুল ব্যবহার নজরে আসে।

ঘণ্টাকর্ণ নামটি পুরাণেও উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্বে চরক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘণ্টাকর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। ঔষধ শাস্ত্রে এর ছাল, বাকল, পাতা, শেকড় ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৫৩ সালে সুইডেনের উদ্ভিদবিদ Carl Linnaeus তাঁর বইতে ভাঁটকে Clerodendrum জেনেরিক নামে অভিহিত করেছেন। এর বিজ্ঞান সম্মত নাম Clerodendrum infortunatum. এক সময় বিজ্ঞান সম্মত তথ্য বিশেষ জোড়াল ভাবে না থাকলেও উত্তরের মানুষ বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে ভাঁট ফুল গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে আসছেন। পরিস্কার শিকড়ের ছাল বেটে তার থেকে প্রাপ্ত রস তাঁরা ডাইরিয়া রোগের উপশমে ব্যবহার করতেন। এই গাছের পাতার রস পেট ব্যাথা ও ম্যালেরিয়া রোগের নিরাময়ে ব্যবহার হতো। উত্তরে জলবাহিত রোগ একটু বেশীই মাথা চারা দেয়। গোল ক্রিমি অনেক শিশুর পেটেই তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি ঘটে। গ্রামে গঞ্জে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন যেখানে পৌঁছায়নি সেখানে গোল ক্রিমি নাশ করতে ভাঁট ফুল পাতার রস সেবন করে থাকে অনেকে। তাছাড়া চর্ম রোগ নিবারণে, বিছের হুল গলাতে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ভাঁট ফুলের সৌন্দর্য পরখ করতে করতে বিজ্ঞানীরাও নেমে পড়েছেন ভাঁটফুলকে নিয়ে গবেষণার কাজে। তাঁরা খুঁজে পেলেন জৈব রসায়নিক বিভিন্ন পদার্থ। তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় clerodolone, clerodone, clerodol এবং clerosterol এর নাম। তাছাড়াও saponin, clerodin কিছু উৎসেচক এবং কিছু তৈলাক্ত পদার্থের হদিশ পেয়েছেন তাঁরা। রসায়নবিদদের থেকে প্রাপ্ত যৌগগুলোকে নিয়ে ঔষধ নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চললেন আরেক ধাপ। তাঁরা দেখালেন কীভাবে জ্বর কমাতে, রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়াতে, শরীরের ব্যথা কমাতে এমন কি সদ্য মাতৃত্ব লাভকারী মায়ের স্তনের দুধ কীভাবে বারানো যায় তাঁর এক নতুন দিশা। একেবারে এই সময়ের গবেষকেরা দেখিয়েছেন ভাঁটফুল গাছের থেকে প্রাপ্ত নির্যাস বেশ কিছু অণুজীবকে দমিয়ে দিতে সহযোগিতা করে।

আজকাল কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষকদের ভাঁট পাতা থেকে প্রাপ্ত নির্জাস ধান খেতেও ছড়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন একটি বিশেষ ধরনের গান্ধিপোকা rice bug (Leptocorisa acuta)-র ধান গাছে আক্রমণ রোধ করতে পারে। আবার এর জলীয় নির্জাস চা বাগানে পাওয়া যায় এমন mosquito bug (Helopeltis theivora) এবং লাল বর্ণের একটি মাকড়শা (Oligonychus coffeae)-র চা গাছে আক্রমণকে রোধ করতে পারে। পরিশেষে বলা যায়, আজও অবহেলায় নিজেদের অস্তিত্ব পথের ধারে বা রেল লাইনের পারে অযত্নে গজিয়ে ওঠে নিজেদের শোভা বিলিয়ে দিচ্ছে যে ভাঁট ফুল, তাকে একটু যত্ন করি সকলে, বন থেকে নিয়ে নিজের বাগানে রোপন করি। সৌন্দর্যের বিচারে এই ফুল স্থান পেতে পারে অতিথি আপ্যায়নের কাজে অথবা ফুল দানিতে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠুক ভাঁট গাছের বানিজ্যিক চাহিদা। উত্তর বঙ্গের দুটি প্রধান স্তম্ভ কৃষি এবং চা বাগান দুই জায়গাতেই আরও ব্যাপক ভাবে ভাঁট ফুলের নির্জাস ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাঁট ফুলকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে শিল্প কারখানা। কে বলতে পারে একদিন উত্তরের ভাঁট ফুলই বিশেষ জায়গা নিতে পারে শিল্প বানিজ্যে। জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ উত্তর বঙ্গের অনেক গাছ পালায় হারিয়ে গেছে, আর বেশ কিছু প্রজাতি ভুগছে অস্তিত্বের সঙ্কটে। জঙ্গল ভেবে সাফাই না চালিয়ে তাঁদেরকে নিজের ছন্দে বাড়তে দিতে হবে। মানুষকে বেশী করে জানাতে হবে এর গুরুত্ব সম্পর্কে।

লেখক প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tdcob25@gmail.com • M. 8944996755

ড. সৌমিত্র চৌধুরী

বজ্রপাতের নেপথ্যে

বজ্রপাতের নেপথ্যে আছে বহু কারণ। বিশ্ব উষ্ণায়ন, বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্য গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ইত্যাদি। বর্তমান আলোচনা একটি বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে। গাছপালা কি বজ্রপাতে সাড়া দেয়?

শুরু করতে হবে 'করোনা' দিয়ে। করোনা ভাইরাস নয় কিন্তু। করোনা শব্দটির অনেক মানে। মুকুটের মত দেখতে কোন বস্তুকেও বলে করোনা। সূর্যের চারদিকে যে আলোকছটা দেখা যায় (সূর্য গ্রহণের সময়), তার নাম করোনা। আমাদের দাঁতের উপর অংশের নামও করোনা। 'করোনা' নাম দিয়ে বহু বানিজ্যিক বস্তুও বিশ্ববাজারে ছেড়েছে অনেক কোম্পানি। আবার গাছের পাতা, তারও আছে করোনা। 'বৃক্ষপত্রের করোনা!' আশ্চর্য কথা বইকি। এর সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে অনেক কিছু। বজ্রপাত, মুক্তমূলক ইত্যাদি শব্দ।

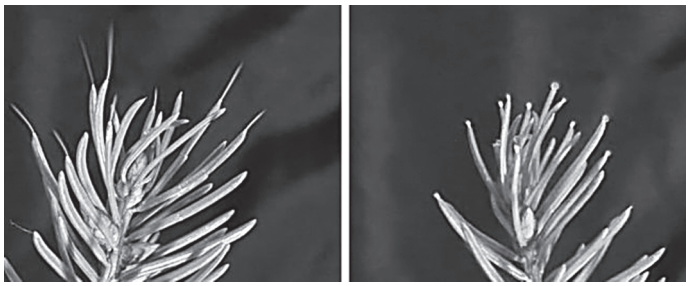

গাছের পাতায় করোনার বিচ্ছুরণ

মুক্ত মূলক, ইংরাজিতে ফ্রি র্যাডিক্যাল (Free Radical)। হতে পারে অনু, পরমানু কিংবা আয়ন। তবে এর মধ্যে বিজোড় সংখ্যার ইলেকট্রন থাকতেই হবে। রসায়নশাস্ত্রের একটি বড় বিষয়, মুক্তমূলক বা ফ্রি র্যাডিক্যাল। জীববিজ্ঞানেও বহু চর্চিত।

ফ্রি-রেডিক্যালের আরেকটু পরিচয় দেওয়া যাক। ফ্রি-রেডিক্যাল শরীরে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। এক প্রকার অতি সক্রিয় অণু এবং বিশেষ ক্ষমতাবান। কোষ ধ্বংস করে। কোষের ডিএনএ-এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। তাই খুবই ক্ষতিকর। ফ্রি-রেডিক্যালের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, হাইড্রক্সিল আয়ন-এর কথা।

অন্য ভাবেও সংজ্ঞায়িত হতে পারে। বিজোড় ইলেকট্রন সম্বলিত যে কোনও প্রজাতির নাম ফ্রি র্যাডিকেল। বাংলায় 'মুক্ত পরমাণুজোট'। যেসব পরমাণুগুচ্ছ স্বাধীনভাবে না থেকে মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মতো যৌগ গঠনে অংশ নেয়, তারাই ফ্রি র্যাডিক্যাল (Radical)।

দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা দিয়ে ভরিয়ে তুললেও শেষ করা যাবে না ফ্রি র্যাডিক্যাল কথন। বহু রকমের এবং বহু ধরনেরে কার্যাবলী এদের। হাইড্রক্সিল ফ্রি র্যাডিক্যালের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আছে অক্সিজেন ফ্রি র্যাডিক্যাল, হাইড্রোপারঅক্সিল, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি। কী ভাবে কাজ করে এরা? কোষের নিউক্লিয়াসে ঢুকে বিভিন্ন সিগন্যাল পাঠায়। জিনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টি নিয়ে বহু গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। লেখা হয়েছে অনেক বইও। একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করা হল (Signalling Mechanisms - from Transcription Factors to Oxidative Stress, Springer publication, 1995; Editors: Lester Packer, Karel W. A. Wirtz).

কোষের নিউক্লিয়াসে ঢুকে ফ্রি র্যাডিক্যাল বিভিন্ন সিগন্যাল পাঠায়। ফলে উদ্দিপ্ত হয় বিভিন্ন কাইনেস অনু। কাইনেস কোনও প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে দ্রুত ক্রিয়াশীল করে দেয়। ফলে শুরু হয় একের পর এক ঘটনা। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে রোগ, দ্রুত বার্ধক্য, এমনকি ক্যান্সারও।

প্রতিহত করবার উপায়? ক্রিয়াশীল ফ্রি র্যাডিক্যালকে শরীরের মধ্যে প্রশমিত করে ফেলা। বিশেষ কিছু খাদ্য, ফল এবং সব্জি গ্রহণের মধ্য দিয়ে এমনটা করা সম্ভব। ফলের মধ্যে থাকে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট, ফ্ল্যাভন জাতীয় অনু। এরা অক্সিজেন ফ্রি র্যাডিক্যালকে প্রশমিত (quench) করে দিতে পারে। শরীর সুস্থ রাখবার সহজ এক উপায় এটি।

শরীরের সব ধরণের কোষে মুক্ত মুলকের প্রভাব বহু আলোচিত। অসংখ্য রোগ সৃষ্টি করে ফ্রি র্যাডিক্যল। দুনিয়া জুড়ে গবেষণা চলছে। আমরাও গবেষণা করেছি ফ্রি র্যাডিক্যাল, অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট এবং সিগন্যাল প্রবাহ নিয়ে। একটি মাত্র গবেষণা পত্র উল্লেখ করলাম (A novel tin based hydroxamic acid complex induces apoptosis through redox imbalance and targets Stat3/JNK1/MMP axis to overcome drug resistance in cancer, K. Bannerjee, S K Choudhuri et al, Free Radical Research, Free Radical Research 55, 2021, 9-10)

এত কথা বলা হল কেন? অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট, ফ্রি রেডিক্যালের প্রভাব কী শুধু জীববিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব আর ওষুধ শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ? এমনটা নয় কিন্তু। প্রকৃতির বহু ঘটনায় জড়িয়ে আছে ফ্রি রেডিক্যাল বা মুক্তমূলক। প্রকৃতির কোনঘটনা? আমাদের আলোচনা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন একটি প্রশ্ন নিয়ে। কী প্রশ্ন? মুক্ত মুলকের সঙ্গে বজ্রপাতের কি কোন সম্পর্ক আছে?

আছে। বহুকাল আগেই গোচরে এসেছিল একটি বিষয়। গাছপালা বজ্রপাতে সাড়া দেয়। বিদ্যুতক্ষেত্রের প্রভাবে বিশেষ কিছু কর্ম সম্পাদন করে বৃক্ষকুল। কেমন সেই কর্ম? উঁচু মানের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সম্মুখীন হলে গাছ থেকে বিকিরিত হয় (স্পার্ক) তড়িৎকণা। অর্থাৎ পরিবেশে বিদ্যুৎ (চার্জ) ছড়িয়ে দেয় বৃক্ষরাজি। এই বিদ্যুৎ স্পার্কের নাম করোনা।

কী হয় এর ফলে? ঘটে অনেক কিছু। গাছপালার বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়া বিষয়টি নিয়েই এখনকার আলোচনা।

বজ্রপাতের সময় অথবা গবেষণাগারে শক্তিশালী বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের

অধীনে গাছকে স্থাপন করলে, বৃক্ষ নিঃসরণ করে বৈদ্যুতিক চার্জ (করোনা)। কী ঘটে তার ফলে?

ঘটে অনেক কিছু এবং ঘটনার ফল সুদূর প্রসারী। উঁচু মানের বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্মুখিন হলে বৃক্ষ থেকে নির্গত হয় হাইড্রক্সিল (hydroxyl, OH.) এবং হাইড্রোপারক্সিল (Hydro peroxyl) নামের দুই ধরণের রেডিক্যাল। র্যাডিক্যাল অতি দ্রুত বিক্রিয়া করতে সক্ষম। মুহূর্তেই বস্তুর রাসয়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

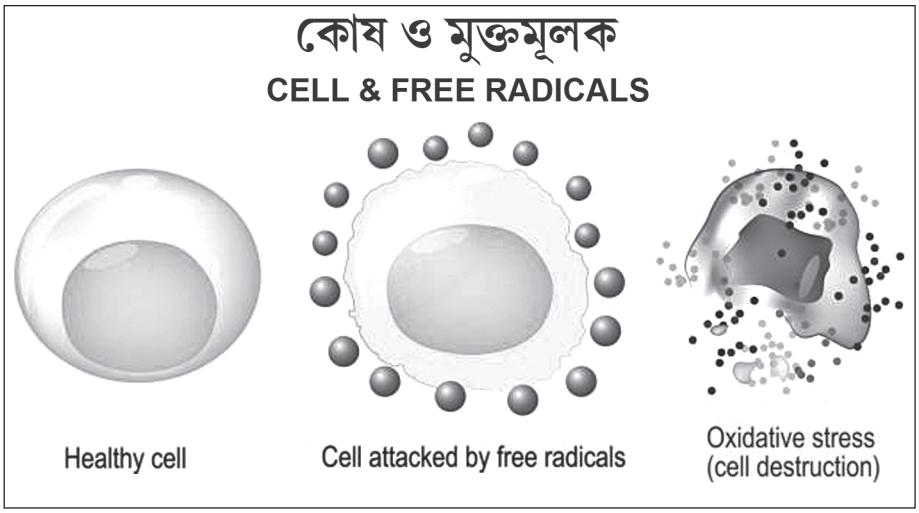

হাইড্রক্সিল (hydroxyl, OH.) আর হাইড্রোপারক্সিল, এই দুই ধরণের র্যাডিক্যালই ঋণাত্মক (Negative)। অন্য পদার্থ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজেরা বিজারিত হয়ে যায় এবং অন্যকে জারিত করে। অর্থাৎ ইলেকট্রন গ্রহণ এবং বর্জন কাজের মধ্য দিয়ে দাতা এবং গ্রহিতা উভয় পদার্থই তড়িৎ বিহীন অনুতে পরিণত হয় যায়।

প্রকৃতিতে এর প্রভাব অনেক। বাতাসে উপস্থিত দূষণকারী পদার্থকে জারিত করে দেয় হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল। বায়ুমণ্ডলের গ্যাসকে জারিত করবার মুল কাজটাই সম্পন্ন করে হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল।

বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে গ্রিনহাউস গ্যাস (যেমন, কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাস্প)। এখন প্রশ্ন, হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল যখন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি কারি গ্রিনহাউস গ্যাসকে জারিত করে? ধরা যাক গ্রিনহাউস গ্যাসটি মিথেন। জারিত হয়ে দূষণ সৃষ্টিকারী মিথেন বাতাস থেকে অপসারিত হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় বায়ুদূষণ রোধ বা উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হতে পারে।

আবার উল্টো ভাবে, এই র্যাডিক্যাল বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া করে? তখন তৈরি হবে ওজোন গ্যাস। বাতাসের উপরিভাগে এর বড় ভূমিকা আছে। মানুষের শরীরে এর বিরূপ প্রভাব। এয়ারোসল তৈরি করে বায়ু দূষণকেও বাড়িয়ে দেবে।

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলিকে জারিত করবার বেশিরভাগ কাজটাই সম্পাদন করে হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল। আর বাতাসে অতিরিক্ত মাত্রার হাইড্রক্সিল রেডিক্যালের উপস্থিতি ডেকে আনে ঘন ঘন বজ্রপাত। বায়ু দূষণের ছয় ভাগের এক ভাগের জন্য দায়ী বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোক্সিল র্যাডিক্যালের উপস্থিতি।

বাতাসকে দূষণ মুক্ত রাখে হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল। ঘন ঘন বজ্রপাতের দরুন বৃক্ষ থেকে নির্গত হয় এই হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল। ব্যাপক অনুসন্ধান জানান দিয়েছে তথটি। বাতাস যত দুষিত, যত বেশী বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি, ততই ঘন ঘন ঘটে বজ্রপাত।

বজ্রপাত আর বৃক্ষ থেকে করোনা নিঃসরণ, এই দুটি বিষয়ের সম্পর্ক অতি গভীর। হাইড্রক্সিল রেডিক্যাল কি বাতাসের দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়? অন্যভাবে দূষণ মুক্ত বাতাস কি ঘন ঘন বজ্রপাত থেকে ধরিত্রীকে রক্ষা করতে সক্ষম? বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন অনেক। গবেষণাও চলছে নিরন্তর। সব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চলেছে (Electric Discharge from Plants May Be Changing Air Quality in Ways We Didn't Expect, NATURE 22 October 2022)। কয়েক মাস আগে আরও উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিয়েছেন আমারিকার বৈজ্ঞানিক ব্রুনে। [Prodigious Amounts of Hydrogen Oxides Generated by Corona Discharges on Tree Leaves, J. M. Jenkins,G. A. Olson,P. J. McFarland, D. O. Miller,W. H. Brune, JGR Atmosphere, 09 August 2022.]

বিষয়টি জটিল এবং বহু প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। তবে বায়ু দূষণের সঙ্গে বজ্রপাতের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

লেখক চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: soumitrag10@gmail.com • M. 9831046252

সংবাদ

৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণসহ নানা কর্মসূচি : বিজ্ঞান দরবার, নেচার টাচ, নদীয়ার যুববার্তা, স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও এলাকার বাসিন্দা এবং বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মচারিরা অংশগ্রহণ করেন

স্মরণ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও নটরাজ মালাকার

একটি জীবন : জাফরুল্লাহ চৌধুরী (১৯৪১-২০২৩)

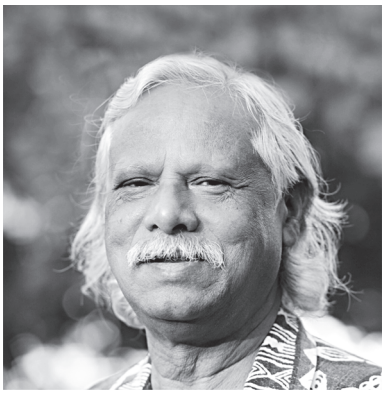

আশির দশকের পশ্চিমবঙ্গ। তখন জন-গণে লড়াই চলছে। না, জনসাধারণের মধ্যে লড়াই নয়। লড়াই দুটো বিশেষণের; জন আর গণ। কোনটা বলা হবে? জনবিজ্ঞান না গণবিজ্ঞান? জনস্বাস্থ্য না গণস্বাস্থ্য? ইন্টারনেটবিহীন সেযুগে পাশের দেশের খবর জানাও সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও ওপার বাংলা থেকে গণস্বাস্থ্য পত্রিকা আসছিল। আসছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের খবর। ১৯৭২ সালে জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। শুরু হয়েছিল এক বিরাট স্বাস্থ্য আন্দোলন। সংগঠনের নাম গোড়ায় ভাবা হয়েছিল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্তু জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মতে, 'জনস্বাস্থ্য' বলতে তো শুধু সরকারি উদ্যোগ বোঝায়। ফলে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার পর, সংগঠনের নাম ঠিক হয়েছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া নয়, লক্ষ্য মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মুক্তিযুদ্ধে ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আর গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্মের পর তাঁর কাজ গেল আরও বেড়ে। ঢাকা শহর থেকে ২২ মাইল দূরে সাভার গ্রামে স্বাস্থ্যপ্রকল্প গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে তিনি শুরু করলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র মূলত জোর দিল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জনসমাজের অংশগ্রহণের ওপর। গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্যারামেডিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হল সংগ্রামী স্বাস্থ্যকর্মী। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভাসেকটমি ও টিউবেকটমি অপারেশন করানো হল সেই স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে। বন্ধ্যাত্বকরণ অপারশনে তাঁদের সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য পুস্তিকা বের করা, পরিবার পরিকল্পনার প্রচার, নিরক্ষরতা দূর করা, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হল তাঁদের কাজ। সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণের জরুরি কাজও হয় এঁদের হাত ধরে। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব দূর হওয়ায় মহিলা রোগীরা বোরখা না পরেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করার সাহস পেলেন। গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগও নিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যে-সব গ্রামে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করল সেখানে শিশুমৃত্যু, প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু, চর্মরোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে কমল। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ভাষায়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য নিয়ে পরীক্ষার-নিরীক্ষার জায়গা ছিল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। তিনি বলেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জনসমাজকে যুক্ত করা যায়'।

১৯৬০-এর দশকে লাতিন আমেরিকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জনসমাজকে যুক্ত করার কাজ শুরু করেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য তিনি লিখেছিলেন হোয়ার দেয়ার ইজ নো ডক্টর। ১৯৮২ সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বের করে 'যেখানে ডাক্তার নেই' শিরোনামে। অনূদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলা হয় 'গ্রন্থটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হল যখন সরকার একটি জাতীয় ওষুধ নীতি ঘোষণা করছেন। ওষুধ নীতি বাস্তবায়িত করতে গেলে প্রয়োজন জনগণকে সচেতন করা — এ-গ্রন্থ সেই সচেতনতা দিতে সাহায্য করবে।'

জাফরুল্লাহ চৌধুরী লড়াই করেছিলেন 'ওষুধ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে'। ১৯৭৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে প্রতিটি দেশের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার কাঠামো অনুযায়ী অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা তৈরির কথা বলা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের ফলে বাংলাদেশে ওষুধের দাম ছিল খুব বেশি। তাই জাফরুল্লাহ চৌধুরী নিজেদের ওষুধ নিজেরাই তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হল গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। টনিক, ভিটামিনের পরিবর্তে জেনেরিক নামে অত্যাবশ্যক ওষুধ উৎপাদন ছিল এর উদ্দেশ্য। ১০-১৫ শতাংশ লাভ রেখেও বহুজাতিক কোম্পানির ওষুধের দামের থেকে ৩৫-৫০ শতাংশ কম দামে ওষুধ বিক্রি করতেন তাঁরা। তবে শুধু ওষুধ কারখানা তৈরি করে সমস্যা সমাধান হবে না, চাই জনমুখী জাতীয় ওষুধনীতি। বাংলাদেশে নথিভুক্ত ওষুধের মূল্যায়ন ও জাতীয় ওষুধ নীতির খসড়া তৈরি করতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আট সদস্যের এক কমিটি গঠন করে। কমিটি বলেছিল সাশ্রয়ী মূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ সরবরাহ করতে না পারলে ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'র লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছতে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গেই চাই জাতীয় ওষুধ নীতি। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ১৬৬৬টি অপ্রয়োজনীয় ওষুধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কাজের ক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশ ছিলনা। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'যে যেখানে লড়ে যায় আমাদের লড়া'। তাঁর কাছ থেকে ভারতের স্বাস্থ্য আন্দোলন দিশা পেয়েছে। কলকাতায় এসে তিনি শুনিয়েছেন বাংলাদেশে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদনের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ের গল্প। ভারতের সংগঠনগুলো বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করত। তাঁর উদ্যোগেই সাভারে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ বিশ্ব গণস্বাস্থ্য সম্মেলন। বিশ্বজুড়ে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ভাবনার সফল রূপায়ণের স্বপ্ন সাকার করার শপথ নিয়েছিল সেই সম্মেলন।

প্রথম লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও দ্বিতীয় লেখক ইতিহাসের গবেষক

email: sabya4@gmail.com • M.9433353349

ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু

কুসংস্কারের অ-আ-ক-খ

কুসংস্কার বলতে সাধারণভাবে ক্ষতিকর মিথ্যা বিশ্বাস বোঝায়। অর্থাৎ তা নিছকই একটি বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত বা যুক্তিযুক্ত কোন সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়, নিছকই কিছু মিথ্যা ধারণাপ্রসূত। এমন সব মিথ্যা বিশ্বাসই ক্ষতিকর হলেও 'কুসংস্কার' শব্দটির যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই 'সুসংস্কার' বলেও কিছু আছে (কেন আছে 'আস্তিকতা'-র বিপরীতে 'নাস্তিকতা')।

ধরা যাক গুরুদেব বা কোন বাবাজির পাদোদক থেকে রোগ সারাবে এমন বিশ্বাস মিথ্যাই। এইভাবে কোন রোগ সারানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে তা ক্ষতিকরও বটে। নিছক ঐ গুরুদেবের পা থেকে জীবাণু সংক্রমণের ক্ষতি নয়, এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাসের ফলে রোগটির প্রকৃত চিকিৎসা বিলম্বিত হয়ে জটিলতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের অলৌকিক শক্তির উপর অসংখ্য অন্ধ বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই তা সত্যি। এক শালিক দেখা অশুভ—এমন বিশ্বাসের পেছনে সামান্যতম কোন যুক্তি নেই (নেহাৎ একাকীত্বের ভয়ের পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া)। কিন্তু তা যদি অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে পরীক্ষার আগে বা ট্রেন ধরার আগে দু-শালিক না দেখতে পাওয়া পর্যন্ত দেরি করা বা মন খুঁতখুঁত করলে, পরীক্ষায় খারাপ করা বা ট্রেন ফেল করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ আছে সীমাহীন।

অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ কারোর পা ছুঁয়ে প্রণাম করা তথা শ্রদ্ধা জানানোটা আমাদের এখানে একটি প্রচলিত অভ্যাস। ছোটবেলা থেকে শিখতে শিখতে তা একটি বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, পা না ছুঁলে ঠিকমত শ্রদ্ধা জানানো হয় না। এর ফলে তাঁর পা থেকে হাতে ধুলো ময়লা লেগে যাওয়ার ভয় থাকে। আরো বড় কথা যাঁকে প্রণাম করার কথা, তাকে যদি প্রণাম না করা হয়, তবে তিনি অপমাণিত অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ হতে পারেন। এই ধরনের বিশ্বাসের এ ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও, এক ছাত্র যখন তার শিক্ষককে পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানায়, তখন তার মধ্যে শ্রদ্ধা জানানোর অনাবিল আগ্রহটাই প্রধান এবং ঐ 'প্রণম্য' ব্যক্তিকে একেবারে দেবী আসনে পুজোআচ্চা করার মত বাড়াবাড়ি না করা হয়, তবে তাকে 'সুসংস্কার' বা শুধু একটি 'সংস্কার' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এবং এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার নিছক ঐভাবে প্রণাম করাটাই শ্রদ্ধা জানানোর একমাত্র বা প্রধান উপায় নয়, বরং সুস্থতর আরো উপায় আছে, যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জনহিতকর কোন সামাজিক কাজ করা, তাঁর আর্থিক দুরবস্থা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। একইভাবে কারো কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময় 'গুড বাই' বলা। কথাটা এসেছে 'গড বি উইথ ইউ' থেকে অর্থাৎ অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের মত একটি কুসংস্কার থেকে (যে বিশ্বাসের অনেকই ক্ষতিকর দিক আছে)। কিন্তু এখন সাধারণভাবে বিদায়ের সময় 'গুডবাই' বললে প্রায় কেউই জানেন না যে, এর সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। তাই বিদায়ের সময় 'গুডবাই' বলাটাকে একটি সাধারণ অক্ষতিকর সংস্কার হিসেবেই ধরা যায়, তবু যাঁরা জানেন, তাঁদের উচিত এর পরিবর্তে 'সি ইউ' বা 'আবার আসবেন' জাতীয় কিছু বলা। সন্তানকে বা প্রিয়জনকে বিদায় জানাতে মা বা ঠাকুমা যখন বলেন 'দুর্গা দুর্গা', তখন তার মধ্যে দুর্গা নামক এক অস্তিত্বহীন দেবীর উপর তাঁর মিথ্যা বিশ্বাসের কুসংস্কারকে চিহ্নিত করে আত্মতৃপ্ত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। তার মধ্যে ছলোছলো চোখের মা-ঠাকুমার আন্তরিকতা ও আকুতিটি প্রধান, নিজেরা তা না করলেই হল। কারণ এভাবে বল্লে, যাকে বলা হচ্ছে তার মধ্যেও এই দুর্গাবিশ্বাস আর এই 'দুর্গা' অলৌকিক ক্ষমতায় বিদায়ী ব্যক্তিকে সুস্থ রাখবেন—এমন কুসংস্কার সঞ্চারিত হয়।

সত্যি কথা বলতে 'কুসংস্কার' কথাটার মধ্যে এই ধরনের দৈবী অলৌকিক শক্তির ধারণা এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তথাকথিত নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'কুসংস্কার' শব্দটির নানা আভিধানিক সংজ্ঞার মধ্যে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেমন সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ 'কুসংস্কার'-এর অর্থ বলা হয়েছে, "সঙ্গত কারণহীন সিদ্ধান্ত; ধর্মে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি"। যে 'সুপারস্ক্রিপশান' শব্দটির বাংলা হিসেবে 'কুসংস্কার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তা অর্থ হিসেবে 'অক্সফোর্ড ডিক্শ্নারি'-তে যা বলা হয়েছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায়—"প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন শক্তি বা এমন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, অজ্ঞাত বা রহস্যময় কোন কিছুর প্রতি অহেতুক ভীতি।" আরো নানা অভিধান খুঁজলেও নিশ্চয়ই এমনই পাওয়া যাবে।

এই ধরনের সংজ্ঞার মূল বক্তব্য থেকে এটিও পরিষ্কার যে, আদিম মানুষ যে অলৌকিক শক্তি, মৃত্যুপরবর্তী প্রাণ ইত্যাদির কল্পনা করেছিল, এবং যার ধারাবাহিকতায় ঈশ্বর, আল্লা, সন্ত ইত্যাদিতে আর আত্মা নয় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, তা নিছক কুসংস্কারই। পাশাপাশি এদের কেন্দ্র করে যেসব তথাকথিত ধর্ম কিছু মানুষ তৈরি করেছে, তাকে অন্যভাবে আঁকড়ে রাখাও কুসংস্কারই। এগুলি যে ক্ষতিকর তাতো প্রমাণিতই। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি, হত্যা, নিপীড়ন, অন্যদের অপমান করা ইত্যাদির পেছনে বড় ভূমিকা পালন করে এইসব কুসংস্কারই।

লেখক চিকিৎসক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sahoo2331953@gmail.com • M. 8777598939

কবিতা

বিবর্তনবাদ

নি র্মা ল্য দা শ গু প্ত

সবার সেরা

কবে যে মানুষ এলো
এই ধরণীতে
সেটা তো সবাই জানে
নানা কাহিনিতে।

কিন্তু কিভাবে এলো
বলো দেখি তা
কিভাবে স্পষ্ট হলো
সেই ছবিটা।

ছোট-বড় প্রাণীদের
ছায়া ধরা আছে
মাটিতে পাথরে তার
ছবি রয়ে গেছে।

সেই সব কাহিনির
গোড়া থেকে সবই
সেই কথা একে একে
লিখে ফেলো দেখি।

কেউ তো বোঝেনি সেটা
বহুদিন ধরে
চার্লি সে ডারউইন
সেটা ধরে ফেলে।

ধীরে ধীরে সযতনে
সাজায় কাহিনি
আমরা সবাই নাকি
'এপ'দেরই জাতি।

গবেষণা করে বহু
দেখেছেন যারা
ডারউইন জেনে রেখো
সকলের সেরা।

সায়েন্স কুইজ (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

১) সূর্যের আলো কোন্ ভিটামিন তৈরিতে সাহায্য করে?
২) গুজরাটের গির অভয়ারণ্যে কোন্ প্রাণী সংরক্ষিত হয়?
৩) LPG কোন্ কোন্ গ্যাসের মিশ্রণ?
৪) চলন্ত গাড়ি থেকে হঠাৎ নেমে গেলে আরোহীরা সামনের দিকে হেলে পড়ে। এর কারণ হল—
ক) স্থিতি জাড্য খ) গতি জাড্য গ) ঘূর্ণন গতি ঘ) আপেক্ষিক গতি
৫) পাকস্থলী থেকে কোন্ অ্যাসিড নিঃসৃত হয়?
৬) মানুষের রক্তের pH (POTENTIAL OF HYDROGEN) কত?
৭) কোন্ শ্রেণির রক্তকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়?
৮) প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পালস্ বিট (রেট) কত?
৯) ফুল ফুটতে কোন্ হরমোন সাহায্য করে?
ক) জিব্বারেলিন খ) অক্সিন গ) ফ্লোরিজেন ঘ) সাইটোকাইনিন
১০) চুলে কোন্ প্রোটিন থাকে?
ক) ইলাস্টিন খ) গ্লায়াডিন গ) কেরাটিন ঘ) সবকটি

উত্তর : ২২ পাতায়

অ নি ন্দ্য দে

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান (গান্ধীর চাদর)

রিচার্ড অ্যাটেনবরোর অস্কার বিজয়ী 'গান্ধী' ছবিটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছও। ঐ ছবিতে একটা দৃশ্য আছে যেখানে গান্ধী তাঁর সুতির চাদরটা এক দরিদ্র রমণীকে দান করেন। গান্ধী চাদরটা গা থেকে খুলে দলা পাকিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। জলে পড়ে চাদরটা খুলে গিয়ে সুন্দরভাবে জলের ওপর ছড়িয়ে যায় আর ভেসে সেই দরিদ্র রমণীর দিকে চলে যায়। দলা পাকানো চাদর জলের ওপর খুলে ছড়িয়ে যায় কেন?

কোন রুমালের এক কোণ যদি জলে ফেলা হয় তাহলে তার একটা বড় অংশ ভিজে যায়। এটা ঘটে কৈশিকতার (capillary action) ফলে। রুমাল বা যে কোনো কাপড়ের টুকরো ভরা আছে সূক্ষ্ম কৈশিক নলে। এই নলের মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠটানের প্রভাবে জল ওঠে। (ব্লটিং পেপারে এই একই নীতিতে কাজ করে)। শেষ অবধি কাপড়ের একটা বড় অংশ ভিজে যায়। একটা দলা পাকানো কাপড় এ ব্যাপারটিই ঘটে। সেটা যখন জল শোষণ করতে থাকে তখন কাপড়ের যে অংশটা শুকনো ও জলের ওপর সেটা ভিজে ভারী হয়ে যায় আর মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে নেমে আসে। কৈশিকতা ও মাধ্যাকর্ষণের মিলিত প্রভাবে দোমড়ানো মোচড়ানো কাপড়টা শেষ অবধি টান টান সোজা হয়ে যায়। রঙিন টিস্যু পেপার দলা কাকিয়ে বালতির জলে ফেলে আপনি নিজে এই ঘটনাটা খুব স্পষ্ট করে দেখতে পারেন। জল শোষণের পর টিস্যু কাগজের রঙ ঘন হয়ে যাবে আর ভারী অংশগুলো নেমে গিয়ে জলতল বরাবর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে।

বিষয়টি "চায়ের আড্ডায় ধাঁধার খটকা : পার্থ ঘোষ ও দীপঙ্কর হোম" বই থেকে সংগৃহীত।